সত্যজিৎ রায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শ্রীসত্যজিৎ রায়

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

মূল্য : ৫·০০

এই লেখকের অন্যান্য বই

প্রফেসর শঙ্কু
বাদশাহী আংটি
এক ডজন গপ্পো
প্রফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা
সোনার কেল্লা
বাক্স-রহস্য
কৈলাসে কেলেঙ্কারী

১

কিছুক্ষণ আগে অবধি জানালা দিয়ে বাইরে নীচের দিকে তাকা-লেই শুকনো হলদে মাটি আর সরু সরু সিল্কের সুতোর মত এঁকে বেঁকে যাওয়া নদী আর মাঝে মাঝে খুদে খুদে গ্রামের খুদে খুদে ঘর ঝাড়ি গাছপালা দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোত্থেকে জানি মেঘ এসে পড়াতে সে সব আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এখন প্লেনের যাত্রীদের দিকে দেখছি।

আমার পাশেই বসেছে ফেলুদা, তার হাতে একটা মহাকাশ ভ্রমণ সম্বন্ধে বই। ফেলুদা অনেক বই পড়ে, তবে আজ পর্যন্ত কখনো ওকে একই বিষয় নিয়ে পর পর দুটো বই পড়তে দেখিনি। কালই রাত্রে কলকাতায় দেখেছি ও তাকলামাকান মরুভূমির উপর একটা বই পড়ছে। তার আগে ও দুটো বই একসঙ্গে পড়ছিল—সকালে একটা, রাত্রে একটা। একটা গল্পের বই, অন্যটা পৃথিবীর নানান দেশের রান্না সম্পর্কে। ও বলে, একজন গোয়েন্দার পক্ষে জেনারেল নলেজ জিনিসটা ভীষণ দরকারি; কখন যে কোন জ্ঞানটা কাজে লেগে যায় তা বলা যায় না।

আমাদের লাইনে প্যাসেজের উল্টোদিকে পাশাপাশি দুটো সীটে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। যিনি দূরে বসে, তাঁর শুধু ডান হাতটা আর নীল প্যান্টের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। হাতের আঙুল দিয়ে তিনি হাঁটুর উপর তাল ঠুকছেন। বোধ হয় আপন মনে গান গাইছেন। যিনি কাছে বসে আছেন, তিনি বেশ আঁটসাঁট চক্‌চকে ভদ্রলোক। হাতের কবজিটা দেখে বেশ জোয়ান মনে হলেও, জুলপির কাছে পাকা চুল থাকাতে মনে হয় ভদ্রলোকের বয়স অন্তত পঁয়তাল্লিশ ত হবেই। একটা স্টেটসম্যান খুলে ভারী মনোযোগ দিয়ে কী জানি পড়ছেন তিনি। ফেলুদা হলে শুধু চেহারা দেখেই লোকটা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারত। আমি সময় কাটানোর জন্য অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও কিছুই বার করতে পারলাম না।

'ওরকম হাঁ করে কী দেখছিস?'

চাপা গলায় ফেলুদার হঠাৎ-প্রশ্নটা চমকে দিয়েছিল। কথাটা বলে ও একবার আড়চোখে ভদ্রলোকের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'যে রেটে খায় লোকটা, সে তুলনায় শরীরে তেমন চর্বি জমেনি এখনো।'

এটা বলতে মনে পড়ল সত্যিই ভদ্রলোক এই এক ঘণ্টার মধ্যেই দুবার চেয়ে চা খেয়েছেন, আর তার সঙ্গে গোটাতিনেক করে বিস্কুটও। বললাম, 'আর কী বুঝলে?

'ভদ্রলোকের প্লেনে চড়া অভ্যেস আছে।'

'কী করে জানলে?'

'একটু আগেই প্লেনটা একটা এয়ার পকেটে পড়ে ধড়াস্ করে বাম্প করেছিল—মনে আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—ওরে বাবা—আমার ত পেটের ভিতরটা কিরকম করে উঠেছিল।'

শুধু তুই কেন, আশেপাশের সকলেই নড়ে চড়ে উঠেছিল, এক-মাত্র উনিই দেখলাম কাগজ থেকে চোখটি পর্যন্ত তুললেন না।'

'আর কী বুঝলে?'

'লোকটার মাথার সামনের দিকের চুল বেশ পরিপাটি রয়েছে, কিন্তু পেছনটা এলোমেলো হয়ে মোরগের ঝুঁটি হয়ে গেছে।'

'সে ত দেখতেই পাচ্ছি।'

'অথচ প্লেনে লোকটা সীটে মাথা ঠেকিয়ে শোয়নি একবারও, একটানা সোজা হয়ে বসে কাগজ পড়েছে, আর না হয় চা-বিস্কুট খেয়েছে। তার মানে দমদমে ওয়েটিং রুমে—'

'বুঝেছি, বুঝেছি—তার মানে ও প্লেন ছাড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই দমদম পেঁছেছিল, আর তাই—'

'ভেরি গুড। হাতে সময় আছে দেখে সোফায় বসে পা ছড়িয়ে মাথা চিতিয়ে বিশ্রাম করে নিয়েছে। তাই পিছনের চুলের ওই দশা।'

ফেলুদার এই ক্ষমতাটা সত্যিই অবাক করে দেবার মতো। আরো আশ্চর্য এই যে, এগুলো বুঝে ফেলার জন্য ওকে আমার মতো ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে থাকতে হয় না অচেনা লোকের দিকে। দু-একবার আড়চোখে দেখে নিলেই কাজ হয়ে যায়।

'লোকটা কোন দেশী বল ত।' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

এটার জবাব দেওয়া ভারী কঠিন। বললাম, 'লোকটা পরে আছে সুট, হাতে আবার ইংরিজি কাগজ—কী করে বুঝব? বাঙালী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী—এনিথিং হতে পারে।'

ফেলুদা ছিক্ করে জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে মাথা নেড়ে বলল, 'কবে যে অবজারভেশন শিখবি তা জানি না। লোকটার ডান হাতে কী রয়েছে?'

'খবরের—না না, একটা আংটি!'

'আংটিতে কী আছে?'

চোখ কুঁচকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম সোনার আংটির মাঝখানে লেখা রয়েছে 'মা'।

অন্য যাত্রীদের সম্বন্ধেও প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে লাউডস্পীকারে বলে উঠল বাগডোগরা পেঁছাতে আর বেশি সময় নেই—'প্লীজ ফাস্ন ইয়োর সীট বেল্টস অ্যান্ড অবজার্ভ দ্য নো-স্মোকিং সাইন।'

বাগডোগরা বলতে অনেকেই মনে করবে আমরা হয়ত দার্জিলিং কিম্বা কালিমপঙ যাচ্ছি। আসলে তা নয়। আমরা যাচ্ছি সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে। এর আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে দু'বার দার্জিলিং গেছি; এবারও প্রথমে দার্জিলিং-এর কথাই হয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেলুদা গ্যাংটকের নাম করল। বাবার হঠাৎ ব্যাঙ্গালোরে একটা কাজ পড়ে গেল বলে উনি আর এলেন না। বললেন, 'তুই পরীক্ষা দিয়ে বসে আছিস, ফেলুরও ছুটি পাওনা হয়েছে—দিন পনেরর জন্য ঘুরে আয়। কলকাতায় বসে ভ্যাপসা গরমে পচার কোন মানে হয় না।'

ফেলুদা গ্যাংটক বলল তার কারণ বোধ হয় এই যে, ইদানীং ও তিব্বত নিয়ে পড়াশুনা করেছে। (সেই ফাঁকে আমিও একটা স্বেন হেদিনের লেখা ভ্রমণ কাহিনী পড়ে ফেলেছি)। সিকিমে তিব্বতের অনেক কিছুই এসে জমা হয়েছে। সিকিমের রাজা তিব্বতী, সিকিমের গুম্ফাগুলোতে তিব্বতী লামাদের দেখা যায়, সিকিমের অনেক গ্রামে তিব্বতী রেফিউজিরা এসে রয়েছে। তিব্বতের গান, তিব্বতের খাবার, তিব্বতের পোশাক, তিব্বতের মুখোশ-পরা নাচ—এ সবই নাকি সিকিমে রয়েছে। আমিও তাই আর গ্যাংটক নিয়ে আপত্তি করিনি। সত্যি বলতে কি, আমার এই খুড়তুতো দাদাটির সঙ্গে যদি উলুবেড়েতেও ছুটি কাটাতে হয়, তাতেও আমি রাজী। অবিশ্যি তার সঙ্গে যদি সে-জায়গায় কোন রহস্যের সন্ধান মেলে তাহলে ত পোয়াবারো। গোয়েন্দাগিরিতে ফেলুদার জুড়ি আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে প্লেন নামল ঠিক সাড়ে সাতটায়। কলকাতা থেকেই বাবা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যাতে আমাদের জন্য এখানে একটা জীপ মজুত থাকে। আমরা সটান জীপে না উঠে আগে এয়ারপোর্টের রেস্টোরান্টে গিয়ে বেশ ভালো করে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম; কারণ এখান থেকে গ্যাংটক যেতে লাগবে প্রায় ছ'সাত ঘণ্টা। রাস্তা খারাপ থাকলে আরো বেশি লাগতে পারে। তবে ভরসা

এই যে আজ সবে চোদ্দই এপ্রিল; মনে হয় এখনো তেমন বর্ষা নামেনি।

অমলেটটা শেষ করে মাছ ভাজা ধরেছি, এমন সময় দেখি প্লেনের সেই ভদ্রলোকটা একটা কোণার টেবিল থেকে উঠে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে আমাদেরই দিকে হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন।

'আপনারা কি ড্যাং না ক্যাং না গ্যাং?'

আমি ত প্রশ্নটা শুনে ঘাবড়েই গেলাম। এ আবার কী হেঁয়ালিতে কথা বলছেন ভদ্রলোক? কিন্তু ফেলুদা তৎক্ষণাৎ হেসে উত্তর দিল 'গ্যাং।'

গ্যাং শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'জীপের ব্যবস্থা আছে? মানে, সোজা কথা—আপনাদের সঙ্গে শেয়ারে লট্‌কে পড়তে পারি কি?'

ফেলুদা বলল, 'স্বচ্ছন্দে', আর আমিও বুঝে ফেললাম যে ড্যাং হচ্ছে দার্জিলিং, ক্যাং কালিমপং আর গ্যাং গ্যাংটক।

ভদ্রলোক বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার নাম শশধর বোস।'

ফেলুদা নিজের ও আমার পরিচয়টা দিয়ে দিল।

'কী ব্যাপার?' ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন। 'হলিডে?'

'তাছাড়া আর কী।'

'আই লাভ গ্যাংটক। আগে গেছেন কখনো?'

'আজ্ঞে না।'

'কোথায় উঠছেন?'

ফেলুদা বেয়ারাকে ডেকে বিল আনার কথা বলে দিয়ে ভদ্রলোককে একটি চারমিনার অফার করে নিজে একটা ধরিয়ে বলল, 'একটা হোটেলে ঘর বুক করা আছে। নাম বোধ হয় স্নো-ভিউ।'

শশধরবাবু বললেন, 'গ্যাংটকের নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা। শুধু গ্যাংটক কেন—সারা সিকিম চষে বেড়িয়েছি। লাচেন লাচুং নামচে নাথুলা কিছুই বাদ নেই। গ্লোরিয়াস! যেমন দৃশ্য, তেমনি শান্তি। পাহাড় চান পাহাড়, অর্কিড চান অর্কিড—রোদ চান, মেঘে চান, বৃষ্টি চান, মিস্ট চান—সব পাবেন। তিস্তা, রঙ্গিত—নদীগুলোর কোন তুলনা নেই। তবে গণ্ডগোল হল রাস্তা নিয়ে—রোড্‌স্—বুঝেছেন। আসলে এদিকের পাহাড়গুলো, যাকে বলে গ্রোইং মাউনটেনস। এখনও বাড়ছে। তাই একটু অস্থির, বুঝেছেন—আর কাঁচা। ইয়াং বয়সে যা হয় আর কি—হে হে!'

'তার ফলেই বুঝি ল্যাণ্ডস্লাইড হয়?'

'ইয়েস আর সে বড় বেয়াড়া ব্যাপার। যাচ্ছেন যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন সামনের রাস্তা বন্ধ—ধ্বসে গেছে। তার মানে ব্লাস্টিং, পাথর ভাঙো, দেয়াল তোল, মাটি ফেল—সে অনেক ঝক্কি। তাও

আর্মি আছে বলে রক্ষে, চটপট সরিয়ে নেয়। তবে এখনো বৃষ্টিটা তেমন নামেনি, তাই খুব একটা গোলমাল হবে বলে মনে হয় না। যাক্—আপনাদের পেয়ে খুব আনন্দ হল, সুবিধেও হল। একা একা এতখানি পথ যেতে হবে ভাবতে বিশ্রী লাগছিল। কম্পানি পেলে গপ্পটপ্প করে সময়টা কেটে যায়।'

ফেলুদা বলল, 'আপনিও কি চেঞ্জে যাচ্ছেন?'

'আরে না মশাই!' ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। 'আমি যাচ্ছি কাজে। তবে সে এক পিকিউলিয়ার কাজ। অ্যারোম্যাটিক প্লাণ্টস জানেন?'

'আপনার বুঝি পারফিউমারির ব্যবসা?'

'ঠিক ধরেছেন। কেমিক্যাল ফার্ম। তার অনেক কাজের একটা হচ্ছে এসেন্স তৈরি করা। সিকিমে কিছু আমাদের প্রয়োজনীয় গাছ আছে সেটা জানি। সেগুলো সংগ্রহ করতেই যাওয়া। আমার পার্টনার আগেই গেছে—দিন সাতেক হল। গাছপালা সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান—বটানিতে ডিগ্রি আছে। আমারও ওর সঙ্গে যাবার কথা ছিল—শেষটায় এক ভাগনের বিয়ের ব্যাপারে ঘাটশিলা চলে যেতে হল। কাল রাত্রেই কলকাতা ফিরেছি।'

বিল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা উঠে পড়লাম। মাল-পত্র তুলে নিয়ে জীপের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, 'আপনাদের কোম্পানিটা কোথায়?'

শশধরবাবু বললেন, 'বম্বে। কোম্পানি প্রায় বিশ বছর হতে চলল। আমি জয়েন করেছি বছর সাতেক। এস্ এস্ কেমিক্যালস। শিবকুমার শেলভাঙ্কার—ওর নামেই নাম।'

বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে সেবক রোড। সেবক রোড থেকে ডান দিকে তিস্তা নদীকে রেখে রাস্তা চড়াই উঠতে আরম্ভ করে। তারপর মাঝে মাঝে নীচেও নামে, দার্জিলিং-এর মত সমানে চড়াই ওঠে না। রঙপো-তে গিয়ে পশ্চিম বাংলার শেষ আর সিকিমের শুরু।

তিস্তার ধারেই তিস্তা বাজার বলে একটা জায়গা আছে যেখানে একটা প্রকাণ্ড ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের রাস্তা ধরতে হয়। তিস্তা বাজারে আমাদের জীপ থামান হল। রোদ থাকার ফলে বেশ গরম লাগছিল, তাই শশধরবাবু বল-লেন, 'কোকা-কোলা খাবেন?' এ জায়গাটা নাকি দু'বছর আগের তিস্তার বন্যায় একেবারে ভেসে গিয়েছিল। দোকানপাট ঘরবাড়ি যা দেখছি সবই নাকি নতুন তৈরি হয়েছে। দেখেও তাই মনে হয়। ব্রিজটাও নতুন; আগেরটা জলের তোড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

শশধরবাবু দেখলাম পর পর দু' বোতল কোকা-কোলা সাবাড় করে দিলেন। সেই সঙ্গে অবিশ্যি আমাদেরও খাওয়ালেন। মনে মনে ভাবলাম—গ্যাংটকে আশা করি কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হবে না। পাঁচ হাজার ফুট হাইট যখন, নিশ্চয়ই এখানের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা হবে।

'কোক' খাওয়া সেরে যখন দোকানে বোতলগুলো ফেরত দিচ্ছি, তখন লক্ষ্য করলাম কিছু দূরেই একটা জীপের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েক-জন লোক (তার মধ্যে দুজন মিলিটারিও আছে) হাতটাত নেড়ে বেশ উত্তেজিতভাবে কী জানি আলোচনা করছে। জীপটা উল্টো দিক থেকে এসেছে—বোধ হয় শিলিগুড়িই যাবে। 'অ্যাক্সিডেণ্ট' কথাটা হঠাৎ কানে আসাতে আমরা তিনজনেই জীপটার দিকে এগিয়ে গেলাম, আর গিয়ে যা শুনলাম সে এক বিশ্রী ব্যাপার। ওদিকে বৃষ্টি না হলেও, গ্যাংটকে নাকি দিন সাতেক আগে বেশ বৃষ্টি হয়েছে, আর তার ফলে পাহাড় থেকে একটা পাথর গড়িয়ে একটা জীপের উপর পড়ে একজন লোক নাকি মারা গেছে। জীপটাও নাকি রাস্তা থেকে গড়িয়ে প্রায় পাঁচশো ফুট নীচে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যে মরেছে তার নাম ধাম এরা কেউ বলতে পারল না, কারণ এরা কেউ গ্যাংটক থেকে আসছে না।।

ফেলুদা খবরটা শুনে বলল, 'একেই বলে নিয়তি। লোকটার নেহাৎই মরার ছিল, না হলে একটা চলন্ত গাড়ির উপর একটা মাত্র খসা পাথর এসে পড়া—এ ঘটনা সচরাচর ঘটে না।'

শশধরবাবু বললেন, 'ওয়ান চান্স ইন এ মিলিয়ন।' তারপর জীপে উঠতে উঠতে বললেন, 'যাবার সময় দৃষ্টিটা পাহাড়ের গায়ে রাখবেন, আর কানটা খোলা রাখবেন। সাবধানের মার নেই মশাই।'

তিস্তা ছাড়াবার কিছুক্ষণ পর থেকেই চারিদিকের দৃশ্য এমন অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল, যে, অ্যাক্সিডেণ্টের কথাটা মন থেকে মুছে গেল। রংপো পেরিয়ে কিছুদূর যাবার পর এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় গরমটা এমনিতেই কমে গিয়েছিল, তার উপরে তিন হাজার ফুট হাইটের মাথায় যখন কুয়াশা আরম্ভ হল, তখন রীতিমত ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। গ্যাংটক আসতে যখন দশ কিলোমিটার বাকি, তখন এক জায়গায় জীপ থামিয়ে স্যুটকেস খুলে কোট আর মাফলারটা বার করে পরে নিলাম। শশধরবাবুও দেখলাম একটা এয়ার ইণ্ডিয়ার ব্যাগ খুলে একটা নীল পুলওভার বার করে সেটা তাঁর ঠাণ্ডা কোটের তলায় চাপিয়ে নিলেন।

ক্রমে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আবছা আবছা চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে নীল রঙের চীনে প্যাটার্নের ছাতওয়ালা সব ঘর বাড়ি। শশধর-

বাবু বললেন. 'পাঁচঘণ্টাও লাগল না। উই আর ভেরি লাকি।'

ক্রমে মিলিটারি ক্যাম্পের পাশ দিয়ে, ফুলের টব সাজানো কাঠের বারান্দাওয়ালা দোতলা দোকানবাড়ির সারি পেরিয়ে লাল নীল সবুজ হলদে ডুরে কাটা পোশাকপরা কাঁধে বাচ্চা নেওয়া মেয়ে, আর বাহারের টুপি আর রঙবেরঙের জামাপরা সিকিমী নেপালী ভুটিয়া তিব্বতী পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীপ গিয়ে পেঁছিল স্নো-ভিউ হোটেলের সামনে। শশধরবাবু ডাকবাংলোয় যাবেন বলে আমাদের কাছ থেকে তখনকার মত বিদায় নিলেন। যাবার সময় বললেন, 'এসব জায়গায়, জানেন ত, চান কি না চান, চারবেলা অন্তত একবার করে দেখা না হয়ে যায় না।'

ফেলুদা বলল, 'আপাতত আপনি ছাড়া আর কাউকেই চিনি না এখানে। বিকেলে একবার ডাকবাংলোর দিকটায় ঢুঁ মেরে আসব।'

'বহুৎ আচ্ছা' বলে হাত নেড়ে জীপের সঙ্গে ভদ্রলোকও কুয়াশায় মিলিয়ে গেলেন।

২

আমাদের হোটেলের নাম যদিও স্নো-ভিউ আর যদিও সত্যি করেই নাকি পিছনের ঘরগুলোর জানালা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, এসে অবধি এখনো পর্যন্ত কুয়াশা কাটেনি বলে আমাদের স্নো ভিউ করা হয়নি। হোটেলের মালিক একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক—নাম মিস্টার বিব্‌রা। আর যে সব লোক হোটেলে রয়েছে, তার মধ্যে মনে হল মাত্র একজনই বাঙালী। এখনো আলাপ হয়নি। বাঙালী বুঝলাম, কারণ দুপুরে কাঁটা চামচ দিয়ে খাবার সময় তাঁর হাত থেকে কাঁটাটা ছিট্‌কে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শুনলাম তিনি বলে উঠলেন, 'ধুত্তেরি।'।

খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলের সামনেই সারি সারি দোকানওয়ালা বড় রাস্তায় বেরিয়ে দু' মিনিটের মধ্যেই ফেলুদা একটা পানের দোকান আবিষ্কার করে সেখান থেকে মিঠে পান কিনল। বলল, 'এ জিনিসটা যে এখানে পাওয়া যাবে তা ভাবিনি।' ও দুপুরে আর রাত্রে রোজ খাবার পরে একটা করে মিঠে পান খায়—তবে খয়ের ছাড়া, কারণ ঠোঁট লাল হওয়াটা ও একেবারেই পছন্দ করে না।

গ্যাংটকের এ রাস্তাটা দেখলাম রীতিমত চওড়া। রাস্তার মাঝখানে জীপ লরি স্টেশন ওয়াগন ইত্যাদি নানারকম গাড়ি লাইন বেঁধে পার্ক করা রয়েছে, আর রাস্তার দুদিকে দোকান। দোকানের নাম দেখে বোঝা যায় ভারতবর্ষের অনেক জায়গার লোক সিকিমে এসে ব্যবসা গেড়ে বসেছে। পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, সিন্ধী—সব রকম লোক সিকিমে এসে দোকান করেছে। বাঙালী প্রায় চোখে পড়ে না বললেই চলে। কুয়াশার মধ্যে বেশি দূর অবধি দেখা না গেলেও একটা জিনিস বেশ বুঝতে পারছিলাম যে দার্জিলিং-এর সঙ্গে এ জায়গাটার বেশ একটা তফাৎ রয়েছে। সবচেয়ে বড় তফাৎ এই যে, এখানে লোকজনের ভিড়টা কম, তাই গোলমালটা কম, আর তাই নোংরাটাও কম।

খাওয়া-দাওয়া হল, মিঠে পানও হল, সবে ভাবছি এবার জায়গাটা একটু ঘুরে দেখলে হয়, এমন সময় হঠাৎ দেখি কুয়াশার মধ্যে দিয়ে

শশধরবাবুকে দেখা যাচ্ছে। তিনি যেন ব্যস্ত ভাবে এই হোটেলের দিকেই এগিয়ে আসছেন। ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক আরো জোরে পা ফেলে এগিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

'কী ব্যাপার?'

'সকালে তিস্তায় যে অ্যাক্সিডেণ্টের কথাটা শুনলেন সেটা কার জানেন?'

প্রশ্নটা শুনেই আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ধাক্কা দিয়ে উঠেছিল. ভদ্রলোকের কথায় সেটা সত্যি হয়ে গেল।

'এস্ এস্। । আমার পার্টনার।'

'বলেন কী? কোথায় যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক?'

'মা গঙ্গাই জানেন। টেরিব্‌ল ব্যাপার!'

'তৎক্ষণাৎ মারা গেছেন?'

'ঘণ্টা চারেক বেঁচে ছিল। হাসপাতালে আনার আধ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। মাথায় চোট, হাড়গোড় ভেঙেছিল। মারা যাবার আগে নাকি একবার জ্ঞান হয়েছিল। আমার নাম করে। 'বোস' 'বোস' করে দু' একবার বলে। তারপরই শেষ।'

'খবরটা পাওয়া যায় কী করে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

আমরা হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম। একতলার ডাইনিং রুম এখন খালি। তিনজনে তিনটে চেয়ার দখল করে বসলাম। শশধরবাবু একটা সবুজ রুমাল কোটের বুক পকেট থেকে বার করে কপালের ঘাম মুছলেন।

'সেও এক ব্যাপার। ড্রাইভারটা মরেনি। পাথরটা গাড়িটায় এসে লেগেছে, আর ড্রাইভারও স্টিয়ারিং-এর কণ্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছে। এমনিতে পাথরটা নাকি খুব একটা বড় কিছু ছিল না, কিন্তু স্টিয়ারিং ঘুরে যাওয়াতে গাড়ি রাস্তা থেকে সরে একেবারে কাত হয়ে খাদে পড়েছে। ড্রাইভার ছিল খাদের উল্টো দিকে—যেই না গাড়ি কাত হয়েছে, ব্যাটা লাফ দিয়ে একেবারে রাস্তায়। মাইনর ইন্‌জুরি—বাঁ চোখের পাশটায় সামান্য একটু ছড়েছে—দ্যাট্‌স অল। জীপ এদিকে শেলভাঙকার সমেত একেবারে পাঁচশ ফুট নীচে। নর্থ সিকিম হাই-ওয়েতে অ্যাক্সিডেণ্ট। ড্রাইভারটা সেখান থেকে গ্যাংটকের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে খবরটা দেবে বলে। পথে কিছু নেপালী মজুরদের দেখে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এস্ এস-এর বডি উদ্ধার করে। তারাই বয়ে আনছিল, এমন সময় একটা আর্মি জীপ এসে পড়ে। তার-পর হাসপাতাল। তারপর...ওয়েল...'

যে লোকটাকে দু' ঘণ্টা আগেও ফুর্তিবাজ বলে মনে হয়েছিল,

তাকে এরকম ভেঙে পড়তে দেখে অদ্ভুত লাগছিল।

'ডেডবডি কী হল?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'বম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বম্বেতে ওর ভাইকে কনট্যাক্ট করেছিল—ব্যারিস্টার ভাই। এস্ এস্-এর স্ত্রী নেই। দুবার বিয়ে করেছিল, দুই স্ত্রীই মারা গেছে। প্রথম পক্ষের একটি ছেলে ছিল—সে বছর চোদ্দ আগে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সে অনেক ব্যাপার। এস্ এস্ ছেলেকে ভীষণ ভালোবাসত, তার অনেক খোঁজ করেছিল, কিন্তু তার আর কোন পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তাই ভাইকেই ইনফর্ম করেছিল। ভাই পোস্টমর্টেম করতে দেয়নি; তাই বডি তার পরদিন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এখনে বলে রাখি—পোস্টমর্টেম কথাটার মানে আমি ফেলুদার কাছেই জেনেছিলাম। কেউ যদি অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনকভাবে মারা যায়, তাহলে পুলিসের তদন্ত হয়, আর তখন পুলিসের ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেয়—কখন মরেছে, কোথায় চোট পেয়ে মরেছে, বিষ খাওয়ানো হয়েছিল কিনা—এই সব আর কি। একেই বলে পোস্টমর্টেম।

ফেলুদা বলল, 'কবে ঘটেছে ব্যাপারটা?'

শশধরবাবু বললেন, 'ইলেভন্থ সকালে। সাতুই ও এখানে এসে পৌঁছেছিল।' তারপর আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি ত এখনো বিশ্বাসই করতে পারছি না!...কার কপালে যে কখন কী ঘটে! তবে আমি থাকলে বোধ হয় এ দুর্ঘটনা ঘটত না।'

'আপনার প্ল্যান কী?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'কী আবার? আর ত এখানে থাকার কোন মানে হয় না। আমি এখন যাচ্ছি কাল সকালে যদি একটা ফ্লাইট পাওয়া যায় তার খোঁজ করতে। চেনাশোনা আছে, হয়ে যাবে বলে মনে হয়।'

শশধরবাবু উঠে পড়লেন।

'চলি। যাবার আগে একবার দেখা হবে নিশ্চয়ই। আপনারা আর এ নিয়ে ভাববেন না। হ্যাভ এ গুড টাইম।'

ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ করে ভুরু কুঁচকিয়ে বসে থেকে সকালে অ্যাক্সিডেণ্টের কথা শুনে শশধরবাবু যে কথাটা বলেছিলেন, সেটাই ফিস্ ফিস্ করে দুবার বলল—'ওয়ান চান্স ইন মিলিয়ন।' তারপর বলল, 'অবিশ্যি মাথায় বাজ পড়েও ত লোকে মরে। সেটাও কম আশ্চর্য নয়।'

আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এখন দেখলাম, আমাদের কাছেই আরেকটা চেয়ারে হোটেলের সেই বাঙালী ভদ্রলোকটি হাতে আনন্দবাজার খুলে বসে আছেন। শশধরবাবু চলে যেতেই তিনি কাগজটা

ভাঁজ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ফেলুদাকে নমস্কার করে তার পাশের চেয়ারে বসে বললেন, 'সিকিমের রাস্তাঘাটে কখন যে কী হয় কিছুই বলা যায় না। এখানে পাথর পড়ে মানুষ মরাটা কিছুই আশ্চর্য না। আপনারা ত আজই এলেন?'

ফেলুদা একটা গম্ভীর হুঁ-এর মত শব্দ করল। ভদ্রলোক একটা স্টীলের ফ্রেমে হালকা সবুজ রঙের কাচওয়ালা চশমা পরেছিলেন। বয়স বোধ হয় ত্রিশ-পাঁয়ত্রিশের বেশি না। ঠোঁট আর নাকের মাঝখানে একটা ছোট্ট চারকোণা গোঁফ আছে যেটাকে বোধ হয় বাটারফ্লাই বলা হয়। আজকাল এরকম গোঁফ খুব বেশি দেখা যায় না।

'বেশ অমায়িক লোক ছিলেন মিস্টার শেলভাঙ্কার।'

'আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'যেটুকু হয়েছিল তাতেই বুঝেছি। সমঝদার লোক—যাকে বলে রসিক আর কি। আর্টের দিকে খুব ঝোঁক। আমার কাছে একটা তিব্বতী মূর্তি ছিল, সেটা উনি কিনলেন মারা যাবার ঠিক দুদিন আগে।'

'উনি ওসব জিনিস কালেক্ট করতেন?'

'কালেক্ট-ফালেক্ট জানি না—আমার সঙ্গে আর্ট এম্পোরিয়ামে আলাপ, দেখি এটা সেটা ঘেঁটেঘুঁটে দেখছেন। বললুম, আমার কাছে একটা পুরনো তিব্বতী মূর্তি আছে, তুমি দেখবে? তা বললে, ডাক-বাংলোয় নিয়ে এসো। গেলুম নিয়ে, দেখালুম। ভদ্রলোক অন দি স্পট কিনে নিলেন। অবিশ্যি জিনিসটাও ছিল খুব ডিসেণ্ট। আমার ঠাকুরদা তিব্বত থেকে এনেছিলেন। ন'টা মাথা, চৌত্রিশটা হাত।'

'আই সী।'

ফেলুদা গম্ভীর ভাব দেখালেও, আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বেশ ইণ্টারেস্টিং লাগছিল, বিশেষ করে ওর হাসিটা, যেটা ওর ঠোঁটের কোণে লেগেই আছে। শেলভাঙ্কারের মৃত্যুটাও যেন ওর কাছে একটা হাসির ব্যাপার।

'আমার নাম নিশিকান্ত সরকার।'

ফেলুদা নিজের পরিচয় না দিয়ে কেবল একটা ছোট্ট নমস্কার করল।

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আমি থাকি দার্জিলিঙে। তিন পুরুষ ধরে আছি আমরা। তবে গায়ের রংটা দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল, তাই না?'

ফেলুদা সামান্য একটু হেসে অভদ্রতা অ্যাভয়েড করল।

'ওদিকটা, আর কালিমপঙটা থরলি ঘুরে দেখা আছে। সিকিমটা আসা হয়নি। অবিশ্যি সেটা আমার নেগ্—মানে নেগ্লিজেন্স। এসে

বুঝছি কী মিস করছিলুম। কাছেপিঠে সব অদ্ভুত জায়গা আছে, জানেন ত? নাকি আপনার সব দেখা?'

ফেলুদা বলল যে সেও নতুন, আজই প্রথম সিকিমের মাটিতে পদার্পণ।

'বাঃ!' ভদ্রলোকের এবার প্রায় ছাব্বিশ পাটি দাঁত দেখা গেল। 'ক'দিন আছেন ত? বেশ ঘুরে-টুরে দেখা যাবে।'

'ইচ্ছে ত আছে।'

'পেমিয়াংচিটা শুনিচি দারুণ জায়গা।'

'যেখানে সিকিমের পুরনো রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে?'

'শুধু রাজধানী কেন? গাইডবুকটা দেখুন না। ফরেস্ট আছে, ব্রিটিশ আমলের ডাকবাংলো আছে, প্রাচীন গুম্ফা আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার ফার্স্টক্লাস ভিউ আছে—আর কত চাই?'

'সুযোগ হলে নিশ্চয়ই যাবো' বলে ফেলুদা উঠে পড়ল।

'উঠছেন?'

ফেলুদা বলল, 'যাই, একটু ঘুরে দেখে আসি। এখানে কি বেরোবার সময় ঘরের দরজা-টরজা বন্ধ করে যেতে হয় নাকি?'

'তা হোটেলের ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া ভালো। তবে চুরিচামারি এখানে নেই বললেই চলে। সারা সিকিমে মাত্র একটি জেলখানা, আর সেটা গ্যাংটকেই। খোঁজ নিয়ে দেখুন—চারটির বেশি কয়েদী নেই সেখানে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি তখনো কুয়াশা কাটেনি। ফেলুদা এদিক-ওদিক দেখে বলল, 'একটা ভুল হয়ে গেল—দুজনের জন্যই এক জোড়া করে হান্টিং বুট কিনে আনা উচিত ছিল। যা বুঝছি, এখানে বাদলা হবে। তার মানেই রাস্তাঘাট পেছল। আর জুতোয় গ্রিপ না থাকলে পাহাড়ে ওঠা মুশকিল।'

আমি বললাম, 'এখানে পাওয়া যাবে না?'

'তা যেতে পারে। বাটার দোকান ত সর্বত্রই আছে। সন্ধে নাগাত ফিরে এসে কিনে নেবো। আপাতত চল একটু এক্সপ্লোর করা যাক।'

বাজার থেকে শহরের দিকে যেতে হলে চড়াই উঠতে হয়। কিছু দূর গিয়েই বুঝলাম এদিকটায় লোকের ভিড় আর বাড়ির ভিড় আরো অনেকটা কম। অল্প যেসব লোক চলাচল করছে, তার মধ্যে কিছু স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা ছেলেমেয়েও দেখলাম। দার্জিলিং-এর মত ঘোড়া দেখলাম না এখানে, তবে জীপ চলে ওখানের চেয়ে অনেক বেশি। সেটা বোধ হয় মিলিটারিরা থাকার দরুণ। গ্যাংটক থেকে ষোল মাইল দূরে ১৪০০০ ফুট হাইটে নাথুলা। নাথুলাতে চীন আর ভারতের

মধ্যের সীমারেখা। এদিকে ভারতীয় সৈন্য আর ওদিকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে চীন সৈন্য।

আরো কিছু দূর হেঁটে যাবার পর একটা মোড়ের মাথায় এসে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ একটা ঝলমলে রং চোখে পড়ল। একটু এগোতেই বুঝলাম সেটা আর কিছুই না—একটি লোক, ভারী বাহারের পোষাক পরে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার পা থেকে মাথা অবধি রঙের বাহার। পায়ে হলদে জুতো, প্যাণ্টটা হল নীল রঙের জীনস, সোয়েটারটা টকটকে লাল, আর তার গলার ফাঁক দিয়ে ভিতরে সবুজ সার্টের কলার দুটো বেরিয়ে আছে। সার্টের ঠিক উপরেই, থুতনির নীচে, একটা সাদার উপর কালো নকশা করা স্কার্ফ। লোকটার মুখের রং হালকা হলদে আর ফ্যাকাশে গোলাপী মেশানো, আর চুল—শুধু চুল নয়, গোঁফদাড়িও—বাদামী রঙের। দেখেই বোঝা যায় ইনি একজন বিদেশী হিপি। দাড়ি থাকার ফলে বয়স বোঝা মুশকিল, তবে মুখের চামড়া একটুও কুঁচকোয়নি। মনে হয় ফেলুদারই বয়সী—মানে ত্রিশের একটু নীচেই।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে মৃদু হেসে ঠাণ্ডা মোলায়েম সুরে বললেন 'হ্যালো'।

ফেলুদাও উত্তরে 'হ্যালো' বলল। এবার লক্ষ্য করলাম হিপির কাঁধ থেকে দুটো ক্যামেরা ঝুলছে, আর তার সঙ্গে একটা চামড়ার ব্যাগ। তাতেও হয়ত ক্যামেরারই জিনিসপত্র রয়েছে। একটা ক্যামেরার নাম 'ক্যানন' দেখে বুঝলাম সেটা জাপানী। ফেলুদার সঙ্গেও তার জাপানী ক্যামেরাটা ছিল, আর সেটা দেখেই বোধ হয় হিপি বললেন, 'নাইস ডে ফর কালার।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'তোমাকে কিছু দূর থেকে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখে আমারও সেই কথাটাই মনে পড়ছিল, তবে দুঃখের বিষয় ভালো কালার ফিল্ম এখন আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য না হলেও দুর্মূল্য।'

হিপি বলল, 'সেটা জানি। আমার কাছে কালারের স্টক আছে, প্রয়োজন হলে আমাকে বোলো।'

হিপি যদিও ইংরিজিতে কথা বলছিল, উচ্চারণ শুনে তার জাতটা বুঝতে পারলাম না। ফরাসী অথবা অ্যামেরিকান হলে চন্দ্রবিন্দুটা একটু বেশি ব্যবহার করত, আর ইংরেজ হলে ত বোঝাই যেত। ইনি কিন্তু ওই তিনটি জাতের একটিও নন।

ফেলুদা বলল, 'তুমি কি বেড়াতে এসেছ?'

হিপি বলল, 'আমি ছবি তুলতে এসেছি। সিকিম সম্বন্ধে একটা বই করার ইচ্ছে আছে। আমি একজন প্রোফেসনাল ফটোগ্রাফার।

'কদ্দিন আছ এখানে?'

'এসেছি নাইন্থ। পাঁচদিন হল। তিনদিনের ভিসা ছিল, বলে-কয়ে বাড়িয়ে নিয়েছি। আরো দিন সাতেক থাকার ইচ্ছে।'

'কোথায় উঠেছ?'

'ডাকবাংলো। এই যে রাস্তাটা ডান দিকে উঠে গেছে—এইটে দিয়ে একটু উঠে গিয়েই ডাকবাংলো।'

ডাকবাংলো শুনেই আমার কানটা খাড়া হয়ে উঠল। শেলভাঙ্কারও ত বোধহয় ডাকবাংলোতেই ছিলেন।

'তাহলে যে ভদ্রলোকটি অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেলেন, তার সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ ছিল?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

হিপি আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভেরি স্যাড। আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল। হি ওয়াজ এ ফাইন ম্যান, অ্যাণ্ড—'

এইটুকু বলেই হিপি থেমে গেল। দেখে মনে হল সে হঠাৎ কেন জানি চিন্তিত হয়ে পড়েছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে প্রায় আপন মনেই বলল, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

'কী ব্যাপার?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'উনি এখানে এসে একটা আশ্চর্য মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন একটি বাঙালী ভদ্রলোকের কাছ থেকে। হি পেড ওয়ান থাউজ্যাণ্ড রুপিজ ফর ইট।'

'এক হাজার!' ফেলুদা অবাক হয়ে বলল।

'হ্যাঁ। জিনিসটা কেনার পর ও এখানকার টিবেটান ইনস্টিটিউটে সেটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তারা নাকি বলেছিল মূর্তিটা একটা আশ্চর্য উঁচুদরের দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কিন্তু—'ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমার খট্‌কা লাগছে এই ভেবে যে, মূর্তিটা গেল কোথায়?'

'তার মানে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল। 'তার ডেড বডি ত শুনলাম বম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তার জিনিসপত্রও নিশ্চয়ই সেই সঙ্গেই গেছে—তাই নয় কি?'

হিপি মাথা নাড়লেন। 'অন্য সব জিনিস ফেরত গেছে সেটা ঠিকই, কিন্তু মিস্টার শেলভাঙ্কার মূর্তিটা সব সময়ে তাঁর কোটের বুক পকেটে রাখতেন। বলতেন, এটা আমার ম্যাসকট—আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। সেদিন যখন বেরোন, তখনও সেটা ওঁর পকেটেই ছিল। এটা আমি জানি। অ্যাক্সিডেণ্টের পর ওঁকে হাসপাতালে আনা হয়। তখন আমি সেখানে ছিলাম। ওঁর জামাকাপড় খুলে ওঁর পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বার করে ফেলা হয়। একটা নোটবুক বেরোয়,

মানিব্যাগ বেরোয়, খাপের মধ্যে ভাঙা অবস্থায় ওঁর চশমাটা বেরোয়, কিন্তু মূর্তি বেরোয়নি। অবিশ্যি এমন হতে পারে যে, মূর্তিটা পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল; হয়ত সেটা সেখানেই পড়ে আছে, আর না হয় যারা তাকে তুলে আনে তাদেরই কেউ সেটাকে পকেটস্থ করেছে।'

'কিন্তু এখানের লোকেরা ত শুনেচি খুব অনেস্ট।'

'সেইজন্যেই ত গোলমাল লাগছে।' হিপি থুতনিতে হাত দিয়ে মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ ভাবল। ফেলুদা বলল, 'মিস্টার শেল-ভাঙ্কার সেদিন কোথায় যাচ্ছিলেন সেটা জানেন?'

'সিংগিকের রাস্তায় একটা গুম্ফা আছে, সেখানে আমারও যাবার কথা ছিল, কিন্তু সেদিন সকালে উঠে দিনটা ভালো দেখে আমি ওঁর অনেক আগেই ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে বেরিয়ে পড়ি। উনি বলেছিলেন—পথে যদি তোমাকে দেখি তাহলে তুলে নেবো।'

'হঠাৎ গুম্ফা সম্পর্কে আগ্রহ কেন?'

'সেটা ঠিক জানি না। বোধহয় ডক্টর বৈদ্য এর জন্য কিছুটা দায়ী।'

'ডক্টর বৈদ্য?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। নামটা এই প্রথম শুনছি।

হিপি হেসে বলল, 'এইভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোন মানে হয় কি? চলো, ডাকবাংলোয় চলো—কফি খাবে।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। বুঝলাম ও শেলভাঙ্কার সম্বন্ধে যা কিছু জানবার সব জেনে নিতে চাইছে।

ডান দিকের চড়াই রাস্তাটা দিয়ে উঠতে উঠতে হিপি বলল, 'তাছাড়া আমার পা-টাকেও একটু রেস্ট দেওয়া দরকার। সেদিন পাহাড়ে উঠতে গিয়ে স্লিপ করে একটু মচকেছে। বেশিক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে টনটন করে।'

কুয়াশা হালকা হয়ে আসছে। চারিদিকে যে এত গাছপালা ছিল তা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। হাল্‌কা হয়ে আসা কুয়াশার ফাঁক দিয়ে এখন পাইন গাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে।

খানিক দূর হেঁটেই আমরা ডাকবাংলো পৌঁছে গেলাম। বেশ সুন্দর একতলা বাড়ি; বেশিদিনের পুরনো বলেও মনে হল না।

হিপি তার ঘরে নিয়ে গিয়ে দুটো চেয়ারের উপর থেকে কাগজ-পত্র সরিয়ে আমাদের বসবার জায়গা করে দিয়ে বলল, 'আমার পরি-চয়টাই এখনো দেওয়া হয়নি। আমার নাম হেলমুট উংগার।'

'জার্মান নাম কি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'ঠিকই ধরেছ।' হেলমুট তার খাটেই বসল। ঘরের চারিদিকে জিনিসপত্র ছড়ানো, আলনায় আরো রঙচঙে পোশাক, বাক্সগুলো

আধখোলা, তার মধ্যে কাপড়ের চেয়ে কাগজপত্র ম্যাগাজিন ইত্যাদিই বেশি। কিছু ফোটো রাখা রয়েছে টেবিলের উপর, দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো অবস্থায়। বেশির ভাগই বিদেশের ছবি, কিছু এদেশে তোলা। আমি খুব বেশি বুঝি না, তবে দেখে মনে হল ছবি-গুলো বেশ ভালো।

ফেলুদাও নিজের পরিচয় দিল, যদিও সে যে শখের ডিটেকটিভ সে কথা বলল না। তারপর হেলমুট 'এক্সকিউজ মী' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বোধহয় কফির অর্ডার দিয়ে ফিরে এসে আবার খাটে বসে বলল, 'ডক্টর বৈদ্য ভারী ইণ্টারেস্টিং লোক, তবে কথাটা একটু বেশি বলেন। ডাকবাংলোতেই এসে ছিলেন কয়েকদিন। ভাগ্য গণনা জানেন, ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, যে লোক মরে গেছে তার আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারেন।'

'প্লানচেট জাতীয় ব্যাপার?'

'কতকটা তাই। মিস্টার শেলভাঙ্কারকে অনেক কিছু বলে ভারী আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন। আর পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে মনে হল অনেক পড়াশুনা আছে।'

'তিনি এখন কোথায়?'

'কালিমপং যাবার কথা ছিল। সেখানে নাকি কোন এক তিব্বতী সাধুর সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল। বলেছেন ত আবার আসবেন।'

'মিস্টার শেলভাঙ্কারকে কী বলেছিলেন তিনি? আপনি শুনে-ছেন সে সব কথা?'

'আমার সামনেই কথাবার্তা হয়। তার ব্যবসার কথা বললেন, স্ত্রীর মৃত্যুর কথা বললেন, ছেলের কথা বললেন। এমন কি তিনি যে কিছুদিন থেকে মানসিক উদ্বেগে ভুগছেন সে কথাও বললেন।'

'সেটা কী কারণে?'

'তা জানি না।'

'আপনাকে কিছু বলেননি?'

'না। তবে বুঝতে পারতাম। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। একদিন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় ওঁর একটা টেলিগ্রাম আসে। উনি সেটা পড়ে রীতিমত আপসেট হয়ে পড়েন।'

ফেলুদা বলল, 'মিস্টার শেলভাঙ্কার যে আকস্মিকভাবে মারা যাবেন, এ নিয়ে ডক্টর বৈদ্য কোন ভবিষ্যবাণী করেছিলেন?'

'ঠিক ভবিষ্যদ্বাণী না করলেও, একটা সপ্তাহ একটু সাবধানে থাকতে বলেছিলেন। বলেছিলেন তার সময় ভালো যাচ্ছে না।'

কফি এলো। আমরা তিনজনেই চুপচাপ বসে খেলাম। শেল-

ভাঙ্কারের মৃত্যুর মধ্যে কোন রহস্য আছে কিনা জানা না গেলেও, আমার মন বলছিল কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল রয়েছে। আমার বিশ্বাস ফেলুদারও আমার মতই মনের অবস্থা। কারণ আগেও দেখেছি যে ওর মনে একটা সন্দেহ জাগে, তখন ও চুপচাপ বসে থাকার ফাঁকে ফাঁকে আঙুল মটকায়। এখনও সে আঙুল মটকাচ্ছে।

কফি শেষ করে ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল। বলল, 'তুমি যখন আরো দিন সাতেক রয়েছ, তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। ডক্টর বৈদ্য যদি আসেন তাহলে যেন একটা খবর পাই। আমরা স্নো-ভিউ হোটেলে আছি।'

হেলমুট আমাদের সঙ্গে বাংলোর গেট পর্যন্ত এলো। গুডবাই করার সময় সে শুধু একটা কথাই বলল: 'মূর্তিটা কোথায় গেল সেটা জানতে পারলে খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগত।'

কুয়াশা কাটলে কী হবে, আকাশে মেঘ এখনো কাটেনি। অল্প অল্প ঝিরঝিরে বৃষ্টিও পড়ছিল, তবে এরকম বৃষ্টি ভালোই লাগে। ছাতার দরকার হয় না, গা ভিজল কি না ভিজল বোঝাই যায় না, অথচ শরীরটা বেশ ঠান্ডা হয়ে যায়

বাটার দোকানটা দেখলাম আমাদের হোটেল থেকে খুব বেশি দূর না। দুজনের জন্য হান্টিং বুট কেনা হলে পর ফেলুদা বলল, 'রাস্তাঘাট যখন জানা নেই, তখন আজকের দিনটা অন্তত ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই।'

'কোথায় যাবে?' ট্যাক্সির লাইনের উদ্দেশে হাঁটতে হাঁটতে জিগ্যেস করলাম।

'আপাতত টিবেটান ইনস্টিটিউট। দুর্দান্ত সব থাঙ্কা, পুঁথি আর তান্ত্রিক জিনিসপত্রের সংগ্রহ আছে শুনেছি।'

'তোমার মনে কি কোন সন্দেহ হচ্ছে?' উত্তর পাব কিনা জানি না, তাও প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

'কিসের সন্দেহ?'

'যে মিস্টার শেলভাঙ্কার স্বাভাবিকভাবে মরেননি।'

'এখনো সেটা ভাববার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটেনি।'

'তবে যে মূর্তিটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাতে কী হল? লোকটা পাথর চাপা পড়ে জখম হয়েছে, পকেট থেকে মূর্তি গড়িয়ে পড়েছে, যারা তাকে উদ্ধার করেছে তাদের মধ্যে কেউ সেটিকে দেখতে পেয়ে ট্যাকস্থ করেছে—ব্যস্‌ ফুরিয়ে গেল। খুন করা এমনিতেই সহজ না, তার উপর মাত্র এক হাজার টাকার একটা মূর্তির জন্যে খুন—এ তো ভাবাই যায় না।'

আমি আর কিছু বললাম না। খালি মনে মনে বললাম—একটা রহস্য যদি গজিয়ে ওঠে, তাহলে ছুটিটা জমবে ভালো।

সারি সারি দাঁড়ানো জীপের একটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার নেপালী ড্রাইভারকে ফেলুদা জিগ্যেস করল, 'ভাড়া যায়গা?'

লোকটা বলল, 'কাঁহা যায়গা?'

'টিবেটন ইন্‌স্টিটিউট মালুম হ্যায়?'

'হ্যায়। বৈঠ যাইয়ে।'

আমরা দুজনেই সামনে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসলাম। ড্রাই-ভারটা গলায় মাফলারটা জড়িয়ে নিয়ে মাথায় একটা ক্যাপ চাপিয়ে, জীপটা ঘুরিয়ে যে পথে আমরা শহরে এসে ঢুকেছিলাম, সেই পথে উল্টো মুখে চলতে লাগল।

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে লোকটার সঙ্গে বাৎচিৎ আরম্ভ করে দিল। কথা অবিশ্যি হিন্দিতেই হল; আমি সেটা বাংলায় লিখছি।

'এখানে সেদিন যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সেটার কথা তুমি জান?'

'সবাই জানে।'

'সে ড্রাইভার ত বেঁচে আছে, তাই না?'

'ওঃ—ওর খুব ভাগ্য ভাল। গত বছর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সেও পাথর পড়ে—তাতে ড্রাইভারটাই মরেছিল, আর যাত্রী বেঁচে গিয়েছিল।'

'তুমি এ ড্রাইভারকে চেন?'

'চিনব না? এখানে সবাই সবাইকে চেনে।'

'সে কী করছে এখন?'

'আবার অন্য একটা ট্যাক্সি চালাচ্ছে SKM 463 । নতুন ট্যাক্সি।'

'অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, ও ত নর্থ সিকিম হাইওয়েতে। ' এখান থেকে দশ কিলো-মিটার।'

'কাল একবার নিয়ে যেতে পারবে?'

'কেন পারব না?'

'তাহলে এক কাজ করো। আটটা নাগাত বেরোব—সকালে। আমরা স্নো-ভিউ হোটেলে থাকি—তুমি চলে এসো।'

'বহুৎ আচ্ছা।'

'একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খাড়াই পথ ধরে উঠে গিয়ে টিবেটান ইনস্টিটিউট। ড্রাইভার বলল জঙ্গলে নাকি খুব ভালো অর্কিড আছে—কিন্তু সে সব দেখবার সময় এখন নয়। গাড়ি একেবারে সোজা ইন্‌স্টিটিউটের দরজার সামনে গিয়ে থামল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি. তার গায়ে বোধহয় তিব্বতী ধাঁচেরই সব নকশা করা। চারিদিক এত নির্জন আর নিস্তব্ধ যে একবার মনে হল ইনস্টিটিউট হয়ত বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি দরজা খোলা।

দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখি একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে এসে পড়েছি,

তার দেয়ালে লম্বা লম্বা ছবি ঝুলছে (এগুলোকেই বলে থাঙ্কা), আর মেঝেতে রয়েছে নানারকম খুঁটিনাটি জিনিসপত্রে বোঝাই সারি সারি কাঁচের আলমারি আর শো-কেস।

কোনদিকে যাব বুঝতে পারছি না, এমন সময় একজন ঢোলা সিকিমী পোশাক আর চশমাপরা ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা তাকে ভীষণ ভদ্রভাবে জিগ্যেস করল, 'ডক্টর গুপ্ত আছেন কি?'

ভদ্রলোক ইংরিজিতে উত্তর দিলেন, 'দুঃখের বিষয় কিউরেটর সাহেব আজ অসুস্থ। আমি তাঁর অ্যাসিসট্যাণ্ট। কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি বলুন।'

ফেলুদা বলল, 'না মানে, একটা বিশেষ ধরনের তিব্বতী মূর্তি সম্বন্ধে আমি একটু ইনফরমেশন চাচ্ছিলাম। নামটা জানি না, তবে কোনো এক দেবতার মূর্তি। তার ন'টা মাথা আর চৌত্রিশটা হাত।'

ভদ্রলোক হেসে মাথা নেড়ে বলেন, 'ইয়েস ইয়েস—যমন্তক, যমন্তক। টিবেট ইজ ফুল অফ স্ট্রেঞ্জ গড্স। আমাদের কাছে একটা যমন্তকের মূর্তি আছে, এসো দেখাচ্ছি। কিন্তু ওর বেস্ট স্পেসিমেন এই কিছুদিন আগে একটি ভদ্রলোক আমাদের দেখাতে এনেছিলেন। আনফরচুনেটলি হি ইজ ডেড নাউ।'

'আই সী!' প্রয়োজনে ফেলুদার অ্যাকটিং দেখবার মত।

আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন একটা আলমারির দিকে এগিয়ে গেলাম। যে মূর্তিটা ভদ্রলোক বার করে আমাদের সামনে ধরলেন সেটার চেহারা ভয়ঙ্কর। ন'টা মুখের প্রত্যেকটাতেই একটা হিংস্র ভাব—প্রায় রাক্ষসের মত।

এবার ভদ্রলোক মূর্তিটাকে চিত করে দেখালেন তার তলায় একটা ফুটো। এই ফুটোর ভিতরে নাকি মন্ত্র লেখা কাগজ পাকিয়ে ঢুকিয়ে রাখা হয়, আর তাকে বলে নাকি 'সেক্রেড ইনটেসটাইন।'

মূর্তিটাকে আলমারিতে রেখে ভদ্রলোক বললেন, 'যিনি মারা গেছেন, তাঁর মূর্তিটা ছিল মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা কিন্তু কী আশ্চর্য সুন্দর কারুকার্য! সোনার মূর্তি, আর তাতে নানারকম পাথর বসানো। চোখ দুটো ছিল রুবি পাথরের। আমরা এত সুন্দর মূর্তি এর আগে কখনো দেখিনি।'

ফেলুদা বলল, 'কি রকম দাম হতে পারে সে মূর্তির?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হি পেড এ থাউজ্যান্ড রুপিজ। আমার মতে জলের দরে পেয়েছিলেন। ওর দাম দশ হাজার টাকা হলেও বেশি হত না। আমাদের কিউরেটর নিজে তিব্বত গেছেন; দালাই-

লামার সঙ্গে বসে মড়ার মাথার খুলিতে চা খেয়েছেন, কিন্তু তিনিও অত ভালো মূর্তি কখনো দেখেন নি।'

ভদ্রলোক এর পরে আমাদের আরো অনেক জিনিস দেখিয়ে অনেক কিছু বোঝালেন। ফেলুদা সে সব মন দিয়ে শুনলেও, আমার কোন কথা কানেই ঢুকল না। আমি শুধু ভাবছি—শেলভাঙ্কারের মূর্তির দাম ছিল দশ হাজার টাকা। এক হাজার নয় দশ হাজার! দশ হাজার টাকার মূর্তির লোভে কি একজন আরেকজনকে খুন করতে পারে না? অবিশ্যি তার পরেই আবার মনে পড়ল যে পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে তার জীপে লাগার ফলেই শেলভাঙ্কার মারা গিয়েছিল। তাই যদি হয়, তাহলে ত খুনের কথাটা আসেই না।

টিবেটান ইনস্টিটিউট থেকে বেরোবার সময় আমাদের গাইড ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'যমন্তক সম্বন্ধে হঠাৎ লোকের এত কৌতূহল কেন বুঝতে পারছি না। তোমরা ছাড়া আরেকজন জিগ্যেস করে গেছে।'

'যিনি মারা গেছেন তিনি কি?'

'না না। তাঁর কথা বলছি না। আরেকজন।'

'কে মনে পড়ছে না?'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, 'নাঃ—শুধু প্রশ্নটা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছে না। আসলে সেদিন এখানে একদল আমেরিকান এসেছিলেন, আমাদের চোগিয়ালের অতিথি—তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম...'

ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে যখন জীপে উঠছি, তখন দেখি চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট। দিনের আলো এত শিগগির যাবার কথা নয়। জীপ জঙ্গল থেকে খোলা জায়গায় বেরোনমাত্র বুঝতে পারলাম পশ্চিমে ঘন কালো মেঘই এই অন্ধকারের কারণ। ড্রাইভার বলল, 'দিনের বেলাটা এখানে অনেক সময়ই ভালো যায়, যত দুর্যোগ রাত্তিরে।' আজ আর ঘোরাঘুরির কোন মানে হয় না, তাই আমরা হোটেলে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

গাড়িতে ফেলুদা কোন কথা বলল না। ও যে কী ভাবছে তা বোঝার কোন উপায় নেই, তবে ওর চোখ যে কাজ করে চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চলন্ত গাড়ির জানালার বাইরের সব কিছুর দিকেই ওর সজাগ দৃষ্টি। কোন নতুন জায়গায় এলেই, আগেও দেখেছি, ফেলুদা এইভাবেই প্রায় জায়গাটাকে গিলে খায়। আরেক দিন যদি আমরা এ রাস্তা দিয়ে যাই, আমার বিশ্বাস ফেলুদার পর পর সব দোকানের নাম মুখস্থ হয়ে যাবে। আমি যে কবে ফেলুদার চোখ আর মেমরি পাবো তা জানি না! অবিশ্যি আমার বয়স এখন মাত্র পনের,

আর ওর আঠাশ।

হোটেলে পেঁছে যখন জীপের ভাড়া দিচ্ছি তখন আবার শশধর-বাবুর সঙ্গে দেখা। এখনো সেই ব্যস্ত অন্যমনস্ক ভাবে বাজারের দিক থেকে ফিরছেন। প্রথমে আমাদের দেখতেই পাননি, তারপর ফেলুদার ডাক শুনে একটু চমকে হেসে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। কালকের ফ্লাইটেই যাচ্ছি।'

ফেলুদা বলল, 'বম্বে গিয়ে একটা ব্যাপার একটু খোঁজ করে দেখতে পারেন কি? মিস্টার শেলভাঙ্কার এখানে একটা তিব্বতী মূর্তি কিনেছিলেন। একটা মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য স্পেসিমেন। সেই মূর্তিটা তাঁর জিনিসপত্রের সঙ্গে ফেরৎ গেছে কিনা।'

শশধরবাবু বললেন 'নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু আপনি ব্যাপারটা জানলেন কী করে?'

ফেলুদা সংক্ষেপে নিশিকান্তবাবু আর হিপির কাছে যা জেনেছে সেটা বলল। সব শুনেটুনে শশধরবাবু বললেন, 'বুক পকেটে মূর্তিটা রাখাটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। হি হ্যাড এ গ্রেট প্যাশন ফর আর্ট অবজেক্টস।'

তারপর হঠাৎ মুখের ভাব একদম বদলে ফেলুদার দিকে চেয়ে একটা অবাক হাসি হেসে বললেন, 'ভালো কথা—আপনি যে ডিটেক-টিভ সেটা ত আমাকে বলেননি!'

আমার ত চক্ষু ছানাবড়া। ফেলুদারও দেখি মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'কী করে জানলেন?'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে তাঁর মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। আমি জানি সেটা ফেলুদারই কার্ড; তাতে লেখা আছে 'Prodosh C. Mitter, Private Investigator.

'আপনি যখন জীপের শেয়ারটা দিচ্ছিলেন, তখনই বোহধয় আপনাব কার্ডটা ব্যাগ থেকে সামনের সীটে পায়ের কাছে পড়ে গিয়ে-ছিল। বাংলোয় যখন নামছি তখন ড্রাইভারটা আমায় কার্ডটা দেয়। ভালো করে পড়ে দেখিনি, কারণ চশমাটা ছিল না হাতের কাছে। তার-পর থেকে যা গণ্ডগোল—এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এনিওয়ে-এটা আমি রাখছি—আর এই নিন আমার কার্ড। যদি কোন গোল-মাল দেখেন, আর মনে করেন আমার আসা দরকার—একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন—আর্লিয়েস্ট অ্যাভেইলেব্‌ল ফ্লাইটে চলে আসব।'

'কখন যাচ্ছেন আপনি?'

'কাল ভোরে। হয়ত আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। আসি। হ্যাভ এ গুড টাইম।!'

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করেছে। ভদ্রলোক হাত তুলে গুড বাই করে হনহনিয়ে বাংলোর দিকে চলে গেলেন।

ঘরে এসে ফেলুদা বুট-মোজা খুলে হাত-পা ছড়িয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে বলল— উফ্‌ফ্‌!

সত্যিই, আজ এই প্রথম দিনের এতরকম ঘটনা ঘটল যে উফ্‌ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

'ভেবে দ্যাখ্‌', ফেলুদা সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা ক্রিমিন্যালের যদি ন'টা মাথা হত তাহলে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত। পেছন থেকে এসে খপ করে ধরার আর কোন উপায় থাকত না।'

'আর চৌত্রিশটা হাত?'

'সেও সাংঘাতিক। চৌত্রিশ জোড়া হাতকড়া না হলে অ্যারেস্ট করা যেত না।'

বাইরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম।

ফেলুদা তার হাতবাক্সটা খুলে তার থেকে তার বিখ্যাত নীল খাতাটা বের করল। তারপর শোয়া অবস্থাতেই খাতাটা খুলে বুকের উপর রেখে পকেট থেকে কলমটা বার করে লেখার জন্য তৈরি হল। শেলভাঙ্কার যেভাবেই মরে থাকুক না কেন, ফেলুদা যে অলরেডি রহস্যের গন্ধ পেয়েছে, আর তদন্ত শুরু করে দিয়েছে, সেটা আমার বুঝতে বাকি রইল না।

'বল ত, এখানে এসে এখন পর্যন্ত কার কার সঙ্গে আলাপ হল।'

প্রশ্নটার জন্য মোটেই তৈরি ছিলাম না, তাই প্রথমটা কিরকম হকচকিয়ে গেলাম। ঢোক গিলে বললাম, 'একেবারে বাগডোগরা থেকে শুরু করতে হবে নাকি?'

'দূর গর্দভ। এখন যারা গ্যাংটকে রয়েছে তার মধ্যে বল।'

'এক—শশধরবাবু।'

'পদবী?'

'দত্ত।'

'তোর মুণ্ডু।'

'সরি—বোস।'

'কেন এসেছেন এখানে?'

'ওই যে বললেন কী সুগন্ধী গাছের ব্যাপার।'

'অত দায়সারাভাবে বললে চলবে না।'

'দাঁড়াও। ভদ্রলোকের পার্টনার মিস্টার শেলভাঙ্কারকে মীট করতে। ওদের একটা কেমিক্যাল কম্পানি আছে, যার অনেক কাজের মধ্যে একটা কাজ হল—'

'ও কে—ও কে! নেক্সট?'

'হিপি।'

'নাম?'

'হেলমেট—'

'মুট। মেট নয়। হেলমুট।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'পদবী?'

'উঙগার।'

'আসার উদ্দেশ্য?'

'প্রোফেসনাল ফোটোগ্রাফার। সিকিমের ছবি তুলে একটা বই করতে চায়। তিনদিনের ভিসা পেয়েছিল, বলে কয়ে বাড়িয়ে নিয়েছে।'

'নেক্সট?'

'নিশিকান্ত সরকার। দার্জিলিং-এ থাকেন। তিন পুরুষের বাস। কী করেন জানি না। একটা তিব্বতী মূর্তি ছিল. শেলভাঙ্কারকে—'

দরজায় টোকা পড়ল।

'কাম ইন!' ফেলুদা ভীষণ সাহেবী কায়দায় বলে উঠল।

'ডিস্টার্ব করছি না ত?' নিশিকান্ত সরকারের প্রবেশ। 'একটা খবর দিতে এলুম।'

ফেলুদা সোজা হয়ে বসে ভদ্রলোককে খাটের পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। নিশিকান্তবাবু তার সেই অদ্ভুত হাসি নিয়ে চেয়ারে বসে বললেন, 'কাল লামা ডান্স হচ্ছে।'

'কোথায়?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'রুমটেক। এখান থেকে মাত্র দশ মাইল। দারুণ ব্যাপার। ভূটান কালিমপং থেকে সব লোক আসছে। রুমটেকের যিনি লামা—তাঁর পোজিশন খুব হাই—জানেন দালাই, পাঞ্চেন. তারপরেই ইনি। ইনি তিব্বতেই থাকতেন। ইদানীং এসেছেন। মঠটাও নতুন। একবার দেখে আসবেন নাকি?'

'সকালে হবে না।' ফেলুদা ভদ্রলোককে একটা চারমিনার অফার করল। 'দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাওয়া যেতে পারে।'

'আর পরশু যদি যান, তাহলে হিজ হোলিনেস-এর দর্শনও পেতে পারেন। বলেন ত গুটি চারেক সাদা স্কার্ফ জোগাড় করে রাখি।'

আমি বললাম, 'স্কার্ফ কেন?'

নিশিকান্ত হেসে বললেন, 'ওইটেই এখানকার রীতি। হাইক্লাস

কোন তিব্বতীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে স্কার্ফ নিয়ে যেতে হয়। তুমি গিয়ে তাঁকে স্কার্ফটা দিলে, তিনি আবার সেটা তোমাকে ফেরত দিলেন—ব্যস, ফরম্যালিটি কমপ্লীট।'

ফেলুদা বলল, 'লামাদর্শনে কাজ নেই। তার চেয়ে নাচটাই দেখা যাবে।'

'আমারও তাই মত। আর গেলে কালই যাওয়া ভালো। যা দিন পড়েছে, এর পরে রাস্তাঘাটের কী অবস্থা হবে বলা যায় না।'

'ভালো কথা—আপনি আপনার মূর্তির কথা কি শেলভাঙ্কার ছাড়া আর কাউকে বলেছিলেন?'

নিশিকান্তবাবুর জবাব দিতে দেরি হল না। 'ঘুণাক্ষরেও না। নট এ সোল। কেন বলুন ত?'

'না—এমনি জিগ্যেস করছি।'

'এখানকার দোকানে গিয়ে ওটা একবার যাচাই করব ভেবেছিলাম, তবে তারও প্রয়োজন হয়নি। দোকানেই শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়, তারপর সোজা ডাকবাংলোয় গিয়ে জিনিসটা দিয়ে আসি। অবিশ্যি উনি একদিন রেখে তারপর দামটা দিয়েছিলেন।'

'নগদ টাকা?'

'না না। সেটা হলে আমার সুবিধেই হত, কিন্তু ক্যাশ ছিল না ওঁর কাছে। চেক দিয়েছিলেন। দাঁড়ান—'

নিশিকান্তবাবু তাঁর ওয়ালেট থেকে একটা ভাঁজ করা চেক বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। আমিও ঝুঁকে পড়ে দেখে নিলাম। ন্যাশ-নাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের চেক—তলায় দারুণ পাকা সই—এস শেলভাঙ্কার।

ফেলুদা চেকটা ফেরত দিয়ে দিল।

'কোথাও কোন সাস—মানে, সাসপিশাস কিছু দেখলেন নাকি?' মুখে সেই হাসি নিয়ে নিশিকান্তবাবু জিগ্যেস করলেন।

'নাঃ।' ফেলুদা হাই তুলল। ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। বাইরে একটা চোখ-ঝলসানো নীল বিদ্যুতের পর একটা প্রচণ্ড বাজের শব্দে ঘরের কাঁচের জানালা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। নিশিকান্তবাবু দেখলাম ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন।

'বাজ জিনিসটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না, হেঁ হেঁ। আসি...'

যখন ডিনার খাচ্ছি তখনও বৃষ্টি, যখন শুতে গেলাম তখনও বৃষ্টি, যখন ঘুমোচ্ছি, তখনও এক একবার বাজের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে—আর বৃষ্টির শব্দ পেয়েছি। একবার ঘুম ভেঙে জানা-লার দিকে চোখ পড়াতে মনে হল কে যেন জানালার বাইরের কাঠের

বারান্দাটা দিয়ে হেঁটে গেল। কিন্তু এই দুর্যোগের রাতে কে আর বাইরে বেরোবে? **নিশ্চয়ই** আমার দেখার ভুল। কিম্বা হয়ত ঘুমই ভাঙেনি। পাহাড়ের দিকের জানালার কাঁচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় দেখা লাল পোশাক পরা লোকটা হয়ত আসলে আমার স্বপ্নে দেখা।

৪

কোন ভোরে বৃষ্টি থেমেছে জানি না। সাড়ে ছটায় উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেখি আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, চারিদিকে রোদ ঝলমল, আর আমার ঠিক সামনের পাহাড়ের সারির পিছন দিয়ে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দার্জিলিং-এর চেয়ে অন্যরকম দেখতে, হয়ত অত সুন্দরও না, কিন্তু তাহলেও চেনা যায়, তাহলেও কাঞ্চনজঙ্ঘা।

ফেলুদা আমার আগেই উঠে যোগব্যায়াম সেরে স্নানে ঢুকেছিল, এইমাত্র বেরিয়ে এসে বলল, 'চটপট সেরে নে—অনেক কাজ।'

পনের মিনিটের মধ্যেই আমার সব কিছু সারা হয়ে গেল। ব্রেকফাস্ট খেতে যখন নীচে নেমেছি তখন সবে সাতটা বেজেছে। একটু অবাক লাগল দেখে যে নিশিকান্তবাবু আমাদের আগেই ডাইনিং রুমে এসে হাজির হয়েছেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি ত খুব আর্লি রাইজার মশাই?'

কাছে গিয়ে বুঝলাম, মুখে সেই হাসিটা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোককে কেমন জানি একটু নার্ভাস বলে মনে হচ্ছে।

'আপনাদের, ইয়ে, মানে ভালো ঘুমটুম হয়েছিল?'

বুঝলাম আসলে ওর অন্য কিছু বলার দরকার, আগে একটু পাঁয়তাড়া কষছেন। ভদ্রলোকের গলাটা শুকনো শোনালো।

'মন্দ কী?' ফেলুদা বলল। কেন বলুন ত?'

ভদ্রলোক এদিক ওদিক দেখে নিয়ে তার কোটের বুক পকেট থেকে একটা হলদেটে কাগজ বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন।

'এটা কী ব্যাপার বলুন ত?'

দেখি কাগজটার উপর কালো কালি দিয়ে কয়েকটা অদ্ভুত অক্ষরে কী যেন লেখা রয়েছে।

ফেলুদা বলল, 'এ তো তিব্বতী লেখা বলে মনে হচ্ছে। কোথায় পেলেন?'

'কাল রাত্রে—মানে মাঝরাত্রে—অ্যাট, মানে অ্যাট ডেড অফ নাইট—কেউ আমার ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে।'

'বলেন কী!'

আমার কিন্তু কথাটা শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। নিশিকান্তবাবুর ঘর হল আমাদের পাশের ঘর। ওটাও হোটেলের পিছন দিকে। আমাদের আর ওর ঘরের জানালার বাইরে দিয়ে একই বারান্দা গেছে, আর সেই বারান্দায় ওঠার জন্য কাঠের সিঁড়ি রয়েছে হোটেলের পিছন দিকে।

'এটা রাখতে পারি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'স্বচ্—মানে, স্বচ্ছন্দে। কিন্তু কী লিখেছে, সেটার একটা ইয়ে না করা অবধি...'

'সেটা আর এমন কী কঠিন। তিব্বতী ভাষা-জানা লোকের তো অভাব নেই এখানে। আর কিছু না হোক—টিবেটান ইনস্টিটিউট ত আছে।'

'হ্যাঁ। সেই আর কি।'

'তবে আর কি। আপনি চিন্তা করছেন কেন? এটা হুমকি বা শাসানি গোছের একটা কিছু, সেটা ভাবার ত কোন কারণ নেই। নাকি আছে?'

নিশিকান্তবাবু চমকে উঠে তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললেন, 'সার্টেনলি নট!'

'এমনও ত হতে পারে যে এটায় বলা হয়েছে—তোমার মঙ্গল হোক বা তুমি দীর্ঘজীবী হও।'

'তা ত বটেই। অবিশ্যি, মানে, হঠাৎ, কথা নেই বার্তা নেই, আশীর্বাদটাই বা করবে কেন—হেঁ হেঁ।'

'হুমকিরও কোন কারণ নেই বলছেন?'

'না না। আমি মশাই যাকে বলে নট ইন সেভেন, নট ইন ফাইভ।'

ফেলুদা বেয়ারাকে চা আর ডিমরুটি অর্ডার দিয়ে বলল, 'যাক গে—এ নিয়ে আর ভাববেন না। আমরা ত পাশের ঘরেই রয়েছি। আপনার কোন চিন্তা নেই।'

'বলছেন? আজ সকালে এই প্রথম ভদ্রলোকের অনেকগুলো দাঁত এক সঙ্গে দেখা গেল।

'আলবৎ। চা খেয়েছেন?'

'এবার খাব আর কি।'

'পেট ভরে ব্রেকফাস্ট করুন। রোদ উঠেছে। দুপুরে লামা নাচ দেখার প্রোগ্রাম আছে। কুছ পরোয়া নেহি।'

'আপনাকে যে কী বলে থ্যা—'

'থ্যাঙ্কস দিতে হবে না। আপনার চেকটি যেন না খোয়া যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।'

জীপ ঠিক সময়ই হাজির ছিল। আমরা উঠতে যাব, এমন সময় দেখি আরেকটা জীপ বাংলোর দিক থেকে আসছে। নম্বরটা দেখে কেমন জানি চেনা মনে হল। SKM 463 ওহো—এই নম্বরের গাড়িই ত সেই নেপালি ড্রাইভার চালাচ্ছে, যে অ্যাক্সিডেণ্ট থেকে পার পেয়েছিল। এবার নীল কোট পরা ড্রাইভারকে দেখতে পেলাম, আর তার পাশেই বসে—ওমা, এ যে শশধরবাবু।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'আর্মির কাছ থেকে খবরের জন্য ওয়েট করছিল। বৃষ্টির বহর দেখে ভয় হচ্ছিল রাস্তা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।'

'হয়নি বুঝি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'নাঃ। অবিশ্যি নেহাৎ বেগতিক দেখলে ঠিক করেছিলাম ভায়া কালিংম্প চলে যাবো।'

'এই ড্রাইভারই ত শেলভাঙ্কারের গাড়ি চালাচ্ছিল—তাই না?'

শশধরবাবু হেসে উঠলেন। 'আপনি ত তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন দেখছি। ইয়েস—ইউ আর রাইট। আমি ওকে ডেলিবারেটলি বেছে নিয়েছি। প্রথমত, গাড়িটা নতুন; দ্বিতীয়ত—বাজ কখনো একই জায়গায় দুবার পড়ে না, জানেন ত?'

শশধরবাবু দ্বিতীয়বার গুডবাই করে বাজারের রাস্তা দিয়ে নীচের দিকে চলে গেলেন। আমরা আমাদের জীপে উঠলাম। ড্রাইভারকে বলাই ছিল কোথায় যাব, তাই আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে রওনা দিয়ে দিলাম।

ডাকবাংলোর কাছাকাছি গিয়ে একবার উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম হেলমুটকে দেখা যায় কিনা। কাউকেই দেখতে পেলাম না। কাল কুয়াশায় কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না, আর আজ আকাশে একটুকরো মেঘও নেই। বাঁদিকে শহর অনেক দূর পর্যন্ত নীচে নেমে গেছে। একটা বাড়ি দেখে ইস্কুল বলে মনে হল, কারণ তার সামনেই একটা চারকোণা খোলা জায়গা, আর তার দুদিকে দুটো খুদে খুদে সাদা গোলপোস্ট। এখনো ইস্কুলের সময় হয়নি, না হলে ইউনিফর্ম পরা খুদে খুদে ছেলেদেরও দেখা যেত।

আরো কিছু দূর গিয়ে একটা চৌমাথা পড়ল। ডানদিকে একটা পান-সিগারেটের দোকান, মাঝখানে পুলিশ, বাঁদিকে একটা রাস্তা পিছনে নীচের দিকে চলে গেছে। সামনের দিকে রাস্তাটা দু ভাগ হয়ে গেছে। একটার মুখে একটা গেট—তাতে লেখা ইণ্ডিয়া হাউস। সেটা পাহাড় বেয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। আমরা নিলাম অন্য রাস্তাটা, যেটা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে।

মিনিট খানেক চলার পরেই রাস্তার ডান পাশে পাহাড়ের গায়ে

পাথরের ফলকে খোদাই করে বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখলাম—নর্থ সিকিম হাইওয়ে।

ফেলুদা একটা অচেনা গান গুনগুন করে গাইছিল, সেটা থামিয়ে ড্রাইভারকে জিগ্যেস করল, 'ইয়ে রাস্তা কিৎনা দূরতক গিয়া?'

ড্রাইভার বলল রাস্তা গেছে চুংথাম পর্যন্ত। সেখানে আবার দুটো রাস্তা আছে, যার একটা গেছে লাচেন, আরেকটা লাচুং। দুটো-রই নাম শুনেছি, দুটোরই-হাইট ন হাজার ফুটের কাছাকাছি, আর দুটোই নাকি অদ্ভুত সুন্দর জায়গা।

'রাস্তা ভালো?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

তা ভালো, তবে 'পানি হোনেসে কভি কভি বিগড় যাতা।'

'ল্যাণ্ডস্লাইড হয়?'

'হা বাবু। রাস্তা তোড় যাতা, বিরিজ তোড় যাতা, ট্রাফিক সব বন্ধ হো যাতা।'

শহর ছাড়তে বেশি সময় লাগল না। একটা আর্মি ক্যাম্প পেরো-তেই একেবারে নিরিবিলি জায়গায় এসে পড়লাম। এখন নিচের দিকে তাকালে পাকা বাড়ির বদলে ফসলের খেত দেখা যাচ্ছে। এখন ভুট্টা হয়েছে, ধানের সময় ধান হয়। পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে করা খেত—ভারী সুন্দর দেখতে।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে মাইল পোস্ট পড়ছে, তবে তাতে সব কিলোমিটারে লেখা। প্রথম প্রথম অসুবিধে হচ্ছিল, তারপর মনে মনে হিসেব (৫ মাইল=৮. কিলোমিটার) করে নেওয়ার অভ্যাস হয়ে গেল।

দশ কিলোমিটার ছাড়িয়ে কিছু দূরে গিয়ে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলল, এই হচ্ছে অ্যাক্সিডেণ্টের জায়গা।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম।

এতক্ষণ গাড়ির শব্দে যেটা বুঝতে পারিনি সেটা এবার বুঝতে পারলাম।

জায়গাটা অস্বাভাবিক রকম নির্জন নিস্তব্ধ।

রাস্তা থেকে অনেকখানি নীচে খাদের মধ্যে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, তার একটা সর সর শব্দ আছে, আর আছে মাঝে মাঝে কে জানে কদ্দূর থেকে ভেসে আসা নাম না জানা পাহাড়ে পাখির শিস। এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

আমরা যেদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিক দিয়ে নেমেছে ঢাল, আর ডানদিক দিয়ে পাহাড় খাড়াই উপরে উঠে গেছে। এই পাহাড়ের গা দিয়েই পাথর গড়িয়ে পড়ে অ্যাক্সিডেণ্টটা হয়েছিল। সেই পাথরকে ভেঙে টুকরো করে এখন রাস্তার ধারে

ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলোকে দেখে আর অ্যাক্সিডেণ্টের কথাটা ভেবে পেটের ভিতরটা কেমন জানি করে উঠল।

ফেলুদা প্রথমে চটপট কয়েকটা ছবি তুলে নিল, তারপর রাস্তার বাঁ পাশটায় গিয়ে নীচের দিকে দেখে কয়েকবার খালি হুঁ হুঁ বলল। তারপর ক্যামেরাটা কাঁধ থেকে খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এই ঢাল দিয়ে হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে কিছুদূর নেমে যাওয়া বোধ হয় খুব কঠিন হবে না। তুই এখানেই থাক। আমার মিনিট পনেরর মামলা।'

আমি যে উত্তরে কিছু বলব ওকে বাধা দেবার কোন চেষ্টা করব, তার আর সুযোগই হল না। ও চোখের নিমেষে এবড়ো খেবড়ো পাথর আর গাছগাছড়া লতাপাতা খামচাতে খামচাতে তরতরিয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। আমার কাছে কাজটা বেশ দুঃসাহসিক বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ফেলুদা দেখি তারই মধ্যে শিস দিয়ে চলেছে।

ক্রমে ফেলুদার শিস মিলিয়ে গেল। আমি ভরসা করে নীচের দিকে চাইতে পারছিলাম না, কিন্তু এবার একবার না দেখলেই নয় মনে করে রাস্তার কিনারে গিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিলাম। যা দেখলাম তাতে বুকটা কেঁপে উঠল ফেলুদা পুতুল হয়ে গেছে; না জানলে তাকে দেখে চিনতেই পারতাম না।

ড্রাইভার বলল, 'বাবু ঠিক জায়গাতেই পেঁছেছেন। ওইখানেই গিয়ে পড়েছিল জীপটা।'

ফেলুদার আন্দাজ অব্যর্থ। ঠিক পনের মিনিট পরে খচমচ খড়মড় শব্দ শুনে আবার এগিয়ে গিয়ে দেখি ফেলুদা যেভাবে নেমে-ছিল সেইভাবেই আবার এটা ওটা খামচে ধরে উঠে আসছে। হাতটা বাড়িয়ে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে রাস্তায় তুলেই জিগ্যেস করলাম—'কী পেলে?'

'গাড়ির কিছু ভাঙা পার্টস, নাট বোল্ট, কিছু ভাঙা কাঁচ, একটা তেলচিটে ন্যাকড়া। নো যমন্তক।'

মূর্তিটা যে পাবে না সেটা আমারও মনে হয়েছিল।

'আর কিচ্ছু না?'

ফেলুদা তার প্যাণ্ট আর কোটটা ঝেড়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট জিনিস বার করে আমাকে দেখাল। সেটা আর কিছুই না—একটা ঝিনুকের কিংবা প্লাস্টিকের তৈরি সাদা বোতাম—মনে হয় সার্টের। আমাকে দেখিয়েই বোতামটা আবার পকেটে রেখে ফেলুদা উল্টোদিকে খাড়াই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। 'পাথর...পাথর... পাথর' আপন মনে বিড়বিড় করে চলেছে সে। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'আরেকটু তেনজিঙ্গ না করলে চলছে না।'

এবারে আর ফেলুদাকে একা ছাড়লাম না, কারণ খাড়াই খুব বেশি না, আর মাঝে মাঝে এমন এক একটা জায়গা আছে যেখানে ইচ্ছে করলে একটু জিরিয়ে নেওয়া যায়। ফেলুদা আগেই বলে নিয়েছিল—তুই আগে ওঠ তোর পিছনে আমি। তার মানে হচ্ছে আমি যদি পা হড়কে পড়ি, তাহলে ও আমাকে ধরবে।

খানিক দূরে ওঠার পরেই ফেলুদা হঠাৎ পিছন থেকে বলল—'থাম'।

একটা খোলা সমতল জায়গায় এসে পড়েছি।

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত পা ঝেড়ে চারিদিকটা একবার দেখলাম। ফেলুদা আবার গুনগুন গান ধরেছে, আর দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে পায়চারি করছে।

'হুঁ!'

শব্দটা এলো প্রায় মিনিট খানেক পায়চারির পর। ফ্ল্যাট জায়গাটা যেখানে ঢালু হয়ে নীচে নেমেছে, তারই একটা অংশের দিকে ফেলুদা এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আশেপাশে ঘাস থাকলেও এই বিশেষ অংশটা নেড়া। মাটি আর দু একটা নুড়ি পাথর ছাড়া আর কিছু নেই।

'এখান থেকেই পাথরবাবাজী গড়িয়েছেন। লক্ষ্য করে দ্যাখ—এইখান থেকে শুরু করে ঢাল বেয়ে গাছপালা ভেঙে চলেছে নীচে অবধি। ও ঝোপড়াটা দ্যাখ—ওই ফার্নের গোছাটা দ্যাখ—কীভাবে থেৎলেছে। এগুলো সব পরিষ্কার ইনডিকেশন।'

আমি বললাম, 'কত বড় পাথর বলে মনে হচ্ছে?'

ফেলুদা বলল, 'নীচে ত টুকরোগুলো দেখলি। কত বড় আর হবে? আর এ হাইটে থেকে গড়িয়ে পড়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা সৃষ্টি করার জন্য একটা ছোটখাটো ধোপার পুঁটুলির সাইজের পাথরই যথেষ্ট।'

'তাই বুঝি?'

'তাছাড়া আর কী? এ হল মোমেণ্টামের ব্যাপার। ম্যাস ইনটু ভেলসটি। ধর তুই যদি মনুমেণ্টের তলায় দাঁড়িয়ে থাকিস, আর মনুমেণ্টের উপর থেকে কেউ যদি তাগ করে একটা পায়রার ডিমের সাইজের নুড়িপাথরও তোর মাথায় ফেলে, তাহলে তার চোটেই তোর মাথা ফুটিফাটা হয়ে যাবে। একটা ক্রিকেট বল যত বেশি হাইটে ছোঁড়া যায়, সেটাকে লুফতে তত বেশি চোট লাগে হাতে। লোফার সময় কায়দা করে হাতে টেনে নিতে না পারলে অনেক সময় তেলো ফেটে যায়। অথচ বল ত সেই একই থাকছে, বদলাচ্ছে কেবল হাইট, আর তার ফলে মোমেণ্টাম।'

ফেলুদা এবার নেড়া জায়গাটার পাশে ঘাসের উপর বসে পড়ে বলল, 'পাথরটা কীভাবে পড়েছিল জানিস?'

'কীভাবে?' আমি ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'এই দ্যাখ।'

ফেলুদা নেড়া অংশটার একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখাল। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেখানে একটা ছোট্ট গর্ত রয়েছে। সাপের গর্ত নাকি?

'যদ্দূর মনে হয়', ফেলুদা বলে চলল, 'প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট সিওর হয়ে বলা চলে যে একটা লম্বা লোহার ডাণ্ডা বা ওই জাতীয় একটা কিছু মাটিতে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে পাথরটাকে ফেলা হয়েছিল। তা না হলে এখানে এরকম একটা গর্ত থাকার কোন মানে হয় না। অর্থাৎ—'

অর্থাৎ যে কী আমিও বুঝে নিয়েছিলাম। তবুও মুখে কিছু না বলে আমি ফেলুদাকে কথাটা শেষ করতে দিলাম।

'অর্থাৎ মিস্টার শিবকুমার শেলভাঙ্কারের অ্যাক্সিডেন্টটা প্রকৃতির নয়, মানুষের কীর্তি। অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রূর ও শয়তানি পদ্ধতিতে কেহ বা কাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ—এক কথায়—গণ্ড-গোল, বিস্তর গণ্ডগোল...'

৫

খুনের জায়গা (এখন থেকে আর অ্যাক্সিডেণ্ট বলব না) থেকে হোটেলে ফিরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল ওর একটু কাজ আছে—একটু পরে ফিরবে। আমি জানি যে যদি জিগ্যেস করি কী কাজ তাহলে উত্তর পাব না।

আমরা ফেরার পথে চৌমাথায় হেলমুটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তাকে রুমটেকের নাচের কথা বলতে সেও যেতে চাইল। আর যাবেন নিশিকান্তবাবু। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? আর তার সেই হিজি-বিজি তিব্বতী লেখার মানে করারই বা কী হল?

একবার মনে হল ফেলুদা না আসা পর্যন্ত বাজারের রাস্তায় পায়-চারি করে কাটিয়ে দিই। তারপর মনে হল—নাঃ, হোটেলেই যাই। সঙ্গে একটা গল্পের বই এনেছি, ঘরে বসে সেটা পড়তে পড়তেই ফেলুদা এসে যাবে।

হোটেলে ঢুকতেই দেখলাম নিশিকান্তবাবু গোমড়া মুখ করে ডাইনিং রুমে বসে আছেন। অবিশ্যি আমাকে দেখেই তাঁর সে পুরনো হাসি ফিরে এলো। বললেন, 'দাদা কই?' বললাম, 'একটু কাজে বেরিয়েছেন; আসবেন এক্ষুনি।'

'তোমার দাদার গায়ে খুব জোর, তাই না?'

এ আবার কি রকম প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক? আমি কিছু বলার আগেই বললেন, 'উনি ভরসা দিচ্ছেন বলেই রয়ে গেলুম; তা না হলে আজই পাততাড়ি গুটিয়ে দার্জিলিং পালাতুম।'

'কেন?' ভদ্রলোক হাত কচলাতে শুরু করেছেন। বুঝলাম তাঁর নার্ভাসনেসটা আবার ফিরে এসেছে।

ভদ্রলোক এদিক ওদিক দেখে আবার পকেট থেকে সেই কাগজটা বার করলেন।

'জান ভাই—সাতজন্মে কারুর কোন অনিষ্ট করিনি, অথচ এরকম শাসানি শেষটায় আমাকেই দিলে!'

'ওটার মানে বের করেছেন নাকি?'

ভদ্রলোক বললেন. 'একটা অ্যাং—মানে অ্যাংজাইটি ছিল, তাই

সোজা চলে গেলুম তিব্বত ইনস্টিটিউটে। কাগজটা দেখালুম। কী বললে জান? বললে এ লেখাটার মানে হচ্ছে 'মৃত্যু'। গিয়াংফুং—না ওই জাতীয় একটা কী তিব্বতী কথা। মানে হচ্ছে ডেথ। থার্টি সেভেনে আমার একটা ফাঁড়া আছে তাও জানি।'

আমার একটু বিরক্ত লাগল। বললাম, 'শুধু ত বলেছে মৃত্যু। এমন ত বলেনি যে আপনাকেই মরতে হবে।'

ভদ্রলোক হঠাৎ যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন।

'তাও বটে। মৃত্যু মানে ত এনিবডিজ ডেথ হতে পারে—তাই না?'

'কাগজে লেখা আছে বলেই যে কাউকে মরতেই হবে তারই বা কী মানে আছে'

কিন্তু তাও যেন ভদ্রলোক ভরসা পেলেন না। আবার তাঁর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। তারপর ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে প্রায় নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, 'দক্ষিণের জানালাটা খোলা ছিল...ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল...তার মানে হাওয়া ছিল...বাইরের জিনিস হাওয়ার সঙ্গে ঘরের ভিতর এসে পড়তে পারে। এটা যদি এমনি উট্‌কো কাগজের টুকরো হয়...হয়ত ছেঁড়া পুঁথিটুথির পাতা—কাছা-কাছি ত ছোটখাটো গুম্‌ফাও রয়েছে...একটা ত শহরে ঢোকার মুখ-টাতেই ...হুঁ...হুঁ...'

আমি আর কাল রাত্রে জানালা দিয়ে কী দেখেছি সেটা বললাম না। তাহলে যেটুকু ভরসা পাচ্ছেন ভদ্রলোক, তাও আর পেতেন না। শেষে যেন আর ভাবতে না পেরেই ভদ্রলোক জোর করে তাঁর মন থেকে দুশ্চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'যাক্‌গে! তোমার দাদাই ত রয়েছেন। বেশ কনফিডেন্স পাওয়া যায় ভদ্রলোককে দেখে। খেলোয়াড়-টেলোয়াড় ছিলেন নাকি? না, এক্সারসাইজ করেন?'

'এককালে ক্রিকেট খেলেছেন। এখন যোগব্যায়াম করেন।'

'ঠিক ধরেচি। আজকালকার বাঙালীদের মধ্যে অমন ফিট বডি চোখে পড়ে না। চা খাবে?'

পাহাড়ে ওঠানামা করতে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল, তাই বললাম চায়ে আপত্তি নেই। ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে দু কাপ চা অর্ডার দিলেন। চা এসে পেঁছতে না পেঁছতেই ফেলুদা ফিরে এলো। আসার দশ সেকেন্ডের মধ্যেই নিশিকান্তবাবু তাঁর 'মৃত্যু'র কথাটা ফেলুদাকে বলে দিলেন।

ফেলুদা আরেকবার কাগজটা দেখে বলল, 'আপনাকে এতটা ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছে কেন সেটা আঁচ করতে পারছেন?'

নিশিকান্তবাবু মাথা নাড়লেন, 'আমি স্যার আকাশ পাতাল

ভেবেও এত কূল কিনারা করতে পারছি না।'

ফেলুদা বলল, 'আর ভাববেন না। কারণ না থাকলে কেউ কারুর মৃত্যু কামনা করে না। আমার বিশ্বাস ওটা যেই ফেলে থাকুক না কেন, ঝড়ের রাতে অন্ধকারে ভুল করে ভুল ঘরে ফেলেছে। তিব্বতী তিব্বতীকেই তিব্বতী ভাষায় শাসায়। আপনাকে শাসাতে হলে যে ভাষা আপনি জানেন তাতেই শাসানো স্বাভাবিক। নইলে ত শাসানি মাঠে মারা—তাই নয় কি?'

'তা ত বটেই।'

'ব্যস্—নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আর গোলমাল হলে আপনি ত আছেনই।'

'আমি থাকলে কিন্তু গোলমালটা মাঝে-মধ্যে একটু বেশীই হয়।'

'তাই বুঝি?'

ভদ্রলোকের মুখ আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফেলুদা আর কোনরকম সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে দোতালায় নিজের ঘরে চলে গেল। আমি জানি কাঁদুনে ভীতু লোকদের ফেলুদা বরদাস্ত করতে পারে না। নিশিকান্তবাবু যদি ওর সিমপ্যাথি পেতে চান, তাহলে ওঁকে কাঁদুনি বন্ধ করতে হবে।

আমি চা শেষ করে ঘরে গিয়ে দেখি ফেলুদা আবার তার নীল খাতার উপর ঝুঁকে পড়েছে। আমি ঢুকতেই বলল, 'টেলিগ্রাফ অফিস-গুলোতে বেশির ভাগ লোকই যে অশিক্ষিত সেটা আগেই জানা ছিল—তবে এটা একটু বেশিরকম বাড়াবাড়ি।'

'হঠাৎ টেলিগ্রাফ আপিসে কেন?'

'শশধরবাবুকে একটা কেব্‌ল করে দিলাম। ও পৌঁছবার আগেই অবিশ্যি পৌঁছে যাবে—তাও দেরি করে কোন লাভ নেই।'

'কী লিখলে?'

'হ্যাভ্ রীজ্‌ন টু সাসপেক্ট শেলভাঙ্কারস্ ডেথ নট অ্যাক্সি-ডেণ্টাল। অ্যাম ইনভেসটিগেটিং।'

'বাড়াবাড়িটা কিসে দেখলে।'

'ও। সে অন্য ব্যাপার।'

ফেলুদা নাকি টেলিগ্রাফ আপিসে কেরানিদের ঘুষ দিয়ে গত ক'দিনে শেলভাঙ্কারের নামে কোন টেলিগ্রাম এসেছিল কিনা সেটা জেনে নিয়েছে। 'একটা ছিল শশধরবাবুর টেলিগ্রাম—অ্যাম অ্যারাইভিং ফোর্টিন্‌থ।'

'আর অন্যটা?'

'পড়ে দ্যাখ্'—বলে ফেলুদা তার নীল খাতাটা আমার দিকে

এগিয়ে দিল। দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে—

YOUR SON MAY BE IS A SICK MONSTER—PRITEX.

পড়ে ত চক্ষু চড়কগাছ। সিক্ মনস্টার? রুগ্ন রাক্ষস? সে আবার কী?

ফেলুদা বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে যে কোন গোলমাল করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে—কী গোলমাল। আসল টেলিগ্রামটা কী ছিল।'

আমি বললাম, 'প্রাইটেক্স আবার কী?'

ফেলুদা বলল, 'ওটা বোধহয় ছাপার ভুল নয়। মনে হয় ওটা কোনো গোয়েন্দা এজেন্সির টেলিগ্রাফিক অ্যাড্রেস। PRI অর্থাৎ প্রাইভেট, আর TEX হল TEC-এর বহুবচন। TEC মানে যে ডিটেকটিভ সেটা নিশ্চয়ই তোকে বলে দিতে হবে না।'

'এই টেলিগ্রামটা পেয়েই কি শেলভাঙ্কার ঘাবড়ে গিয়েছিল?'

'কিছুই আশ্চর্য না।'

'আর তার মানে এই এজেন্সিটা শেলভাঙ্কারের ছেলের খোঁজ করছিল?'

'তাইত মনে হয়। কিন্তু Sick Monster!—হরি হরি!'

আমি বললাম, 'কতগুলো রহস্য একসঙ্গে সমাধান করবে বল ত।'

ফেলুদা বলল, 'সেইটেই ত ভাবছি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এইবেলা খাতায় নোট করে ফেলা উচিত। বল ত দেখি একটা একটা করে।'

'এক—Sick Monster।'

'তারপর?'

'পাথর কে ফেলল।'

'গুড।'

'তিন—মূর্তিটা কোথায় গেল।'

'ঠিক হ্যায়।'

'চার—নিশিকান্তবাবুর ঘরে কাগজ কে ফেলল।'

'আর কেন ফেলল। বহুৎ আচ্ছা।'

'পাঁচ—খুনের জায়গায় কার বোতাম।'

'অবিশ্যি সেটা শেলভাঙ্কারের নিজের শার্টের বোতামও হতে পারে। যাই হোক্—বলে চল।'

'ছয়—তিব্বতী ইনস্টিটিউটে গিয়ে কে মূর্তির কথা জিগ্যেস করেছিল।'

'স্প্লেনডিড। আর বছর দশেকের মধ্যেই তুই গোয়েন্দাগিরি শুরু করতে পারবি।'

ফেলুদা ঠাট্টা করলেও বুঝতে পারলাম যে আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি।

'শুধু একটি লোকের সঙ্গে এখন দেখা হওয়া দরকার। মনে হয় তিনি শেলভাঙ্কার সম্বন্ধে জরুরী ইনফরমেশন দিতে পারেন।'

'কে লোকটা?'

'ডক্টর বৈদ্য। যিনি ভবিষ্যৎ বলেন, আর প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন, আর অন্যান্য যাবতীয় ভেল্‌কি প্রদর্শন করেন। শুনে-টুনে লোকটাকে ইণ্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।'

৬

রুমটেক যেতে হলে যে পথে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক আসে, সে পথে খানিকদূর ফিরে গিয়ে তারপর ডান দিকে একটা মোড় নিয়ে নতুন পথে সটান সিধে রাস্তায় চলতে হয়। রুমটেকের হাইট গ্যাংটকের চেয়েও প্রায় এক হাজার ফুট বেশি, কিন্তু যাবার রাস্তা প্রথমে উৎরাই নেমে একেবারে নদী পর্যন্ত গিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই ওঠে। ছোট ছোট গ্রামের বাড়ি আর ভুট্টার খেতের পাশ দিয়ে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে—চারদিকের দৃশ্য দার্জিলিং-এর চেয়ে কোন অংশে কম সুন্দর নয়।

সকালের রোদ এখন আর নেই। হোটেলে থাকতেই মেঘ উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাতে অবিশ্যি এক হিসেবে ভালই, কারণ গরমের কোন সম্ভাবনা নেই। কিছুদিন আগের দুর্ঘটনার জন্যেই বোধহয়, আমাদের ড্রাইভার খুব সাবধানে জীপ চালাচ্ছিল। সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসেছি আমি আর ফেলুদা। পিছনের দুটো সীটে মুখোমুখি বসে আছে, হেলমুট উঙ্গার আর নিশিকান্ত সরকার। হেলমুটের পায়ের ব্যথাটা নাকি সেরে গেছে। ওর কাছে নাকি কি জার্মান মলম ছিল, তাতেই কাজ দিয়েছে। নিশিকান্তবাবুর ভয়ের ভাবটা বোধহয় কেটে গেছে, কারণ এখন উনি গুন গুন করে হিন্দী ফিল্মের গানের সুর ভাঁজছেন। গ্যাংটক শহর এখন আমাদের উল্টোদিকের পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে আছে। মনে হয় শহরটাকে আর খুব বেশি-ক্ষণ দেখা যাবে না, কারণ নীচের উপত্যকা থেকে কুয়াশা উঠতে শুরু করেছে উপরের দিকে।

ফেলুদা এখন পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি। সেটা আশ্চর্য না। আমি জানি ওর মাথার ভিতর এখন সেই ছ'টা প্রশ্নের উত্তর বার করার প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছে। নেহাৎ কাল কথা দিয়ে ফেলেছিল তাই, তা না হলে ও এখন হোটেলের ঘরে বসে নীল খাতায় হিজিবিজি লিখত আর হিসেব করত।

বাইরের ঠাণ্ডা থেকে বেশ বুঝতে পারছি যে আমরা এখন বেশ হাইটে উঠে গেছি। সামনে একটা মোড়। ড্রাইভার জীপে হর্ন দিতে

দিতে সেটা ঘুরতেই দেখলাম সামনে রাস্তার দুধারে ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে বাঁশের এক খুঁটির সঙ্গে আরেক খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে টাঙানো সারি সারি রঙ-বেরঙের চারকোণা নিশান। এই নিশানগুলো টাঙিয়ে দিয়ে তিব্বতীরা নাকি অনিষ্টকারী প্রেতাত্মাদের দূরে সরিয়ে রাখে। কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায় প্রত্যেকটা নিশানে নকশা করা আছে।

একটা ক্ষীণ শব্দ অনেকক্ষণ থেকেই কানে আসছিল। এবার সেটা ক্রমশ জোর হতে আরম্ভ করল। ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ গুরুগম্ভীর শিঙার শব্দ, আর তার সঙ্গে থেকে থেকে ঝম্ ঝম্ করে কাঁসা বা পিতলের ঝাঁঝের আওয়াজ, আর চড়া বেসুরো সানাইয়ের মতো আওয়াজ। এটাই বোধহয় তিব্বতী নাচের বাজনা।

রাস্তাটা গিয়ে এক জায়গায় থেমে গেছে। তারপরে রয়েছে একটা বড় গ্যারাজ গোছের ঘর, যাতে কয়েকটা জীপ রয়েছে, আর বাঁদিকে রয়েছে কিছু দোকান। রাস্তার দু'ধারেও কয়েকটা জীপ আর স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে, আর চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে নানান রঙের পোশাক পরা ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ির দল।

আমাদের জীপটা রাস্তার ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বুঝলাম এটাই রুমটেক মঠের ফটক। নিশিকান্তবাবু বোধহয় হেলমুটের খাতিরেই ইংরিজিতে বললেন, 'দি লামাজ আর ড্যা—মানে ড্যানসিং।' আমরা চারজনে গাড়ি থেকে নামলাম।

গেটের ভিতর ঢুকে দেখি সামনে একটা বিরাট খোলা উঠোন। সেটাকে একটা প্রকাণ্ড সাদা চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা হয়েছে; তাতে আবার গাঢ় নীল রঙের নকশা করা। এত সুন্দর চাঁদোয়া আমি কক্ষনো দেখিনি। চাঁদোয়ার নীচে উঠোনের মেঝেতে লোকেরা সব ভিড় করে বাবু হয়ে বসেছে, আর পিছন দিকে একটা প্রকাণ্ড নকশাকরা পর্দার সামনে আট-দশ জন লোক ঝলমলে পোশাক আর বীভৎস সব মুখোশ পরে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নাচছে। বাজিয়ের দল লাল পোশাক পরে বসেছে নাচিয়েদের ডান দিকে। শিঙাগুলোতে সবচেয়ে গম্ভীর আওয়াজ হচ্ছে, সেগুলো প্রায় পাঁচ-ছ হাত লম্বা। আর সেগুলো বাজাচ্ছে আট দশ বছর বয়সের ছেলেরা। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত থমথমে অথচ জমকালো ব্যাপার। এমন জিনিস এর আগে আমি কখনো দেখিওনি বা শুনিওনি।

হেলমুট উঠোনে পৌঁছান মাত্র পটাপট ছবি তুলতে আরম্ভ করে দিল। আজ তার কাঁধে তিনটে ক্যামেরা। ব্যাগটাও সঙ্গে রয়েছে; তার মধ্যে আরো ক্যামেরা আছে কিনা কে জানে!

নিশিকান্তবাবু বললেন, 'বসবেন নাকি?'

'আপনি কী করছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আমার ত জিনিস দেখা; কালিমপঙে দেখেছি। আমি একটু পেছন দিকটায় গিয়ে মন্দিরটা দেখে আসছি। শুনিচি ভেতরে নাকি অদ্ভুত সব কারুকার্য রয়েছে।

আমি আর ফেলুদা ভিড়ের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। ফেলুদা বলল, 'এসব দেখেশুনে বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি সে কথা ভুলে যেতে হয়। গত এক' হাজার বছরে এ জিনিসের কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।'

আমি বললাম, 'গুম্ফা বলে কেন ফেলুদা?'

ফেলুদা বলল, 'এটা ঠিক গুম্ফা নয়। গুম্ফা হল গুহা। এটাকে বরং মঠ বা মন্দির বলা চলতে পারে। ওই যে উঠোনের দুপাশে এক-তলা ঘরের লাইন দেখছিস—ওখানে সব লামারা থাকে। আর লক্ষ্য কর কত বাচ্চা ছেলে রয়েছে। সব মাথা মুড়োন, গায়ে তিব্বতী জোব্বা। এদের এখন ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। বড় হলে সব লামাটামা হবে।'

'মঠ আর মনাস্টেরি কি এক জিনিস?'

'হ্যাঁ, মঠ—'

এইটুকু বলেই ফেলুদা হঠাৎ থেমে গেল। তার দিকে চেয়ে দেখি তার চোখ দুটো কুঁচকে গেছে, তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। হঠাৎ কী মনে পড়ল ফেলুদার?'

মিনিট খানেক চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে নিজের ওপর একটা ধিক্কারের ভাব দেখিয়ে ফেলুদা বলল, 'পাহাড়ে এলে কি তাহলে আমার বুদ্ধিটা স্লো হয়ে যায়? এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারিনি এতক্ষণ?'

'কী জিনিস?' জিগ্যেস করলাম। 'কোনটা বুঝতে পারনি?'

'Sick Monster! Sick হল সিকিম, তার Monster হল মনাস্টেরি। থ্যাঙ্ক ইউ, তোপ্সে।'

সত্যিই ত! বুঝতে পারা উচিত ছিল। 'তাহলে পুরো টেলি-গ্রামটার কী মানে দাঁড়াচ্ছে?'

ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে সেই পাতাটা খুলে পড়ল—

'YOUR SON MAY BE IS A SICK MONSTER—

—গোড়ার দিকটায় কোন গোলমাল নেই। Is-টাকে In করে নে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে—ইয়োর সান মে বি ইন এ সিকিম মানাস্টেরি। তোমার ছেলে হয়ত সিকিমের কোন মঠে রয়েছে। ব্যস্—পরিষ্কার ব্যাপার।'

'তার মানে শেলভাঙ্কারের যে ছেলে চোদ্দ না পনের বছর আগে

বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সে এখন এখানে রয়েছে?'

'প্রাইটেক্স ত তাই বলছে। এখন, প্রাইটেক্সের কেরামতির দৌড় যে কতখানি তা ত জানি না। তবে এটা ঠিক যে শেলভাঙ্কার যদি টেলিগ্রামের ভুল সত্ত্বেও তার মানেটা আঁচ করে থাকে, তাহলে তার মনে আশার সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ সে ছেলেকে ভালোবাসত, অনেকদিন ধরে তার খোঁজ করেছে।'

'ও যেদিন একটা কোন গুম্ফায় যাচ্ছিল, সেটাও হয়ত টেলিগ্রামটা পাবার পর ছেলের সন্ধানে।'

'কোয়াইট পসিব্ল। আর ছেলে যদি সত্যি করে থেকেই থাকে এ তল্লাটে, তাহলে অবিশ্যি...'

ফেলুদা আবার চুপ করে গেল। মনে পড়ল শশধরবাবু বলেছিলেন শেলভাঙ্কারের ছেলে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তার মানে সে তার বাপের শত্রু।

'উইল...উইল...উইল' ফেলুদা আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছে। 'শেলভাঙ্কার যদি উইলে তাঁর ছেলেকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে সে অনেক টাকা পাবে।'

ফেলুদা ভিড়ের মধ্যে থেকে উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে আমিও। বেশ বুঝতে পারলাম টেলিগ্রামের মানে করতে পেরে ফেলুদা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এদিকে ওদিকে দেখছে সে। ভিড়ের মধ্যে অতিব্বতী ভারতীয় চেহারা খুঁজছে কি?

আমরা দুজনেই ভিড়ের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চললাম। বাঁদিকের একতলা বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে আমরা চললাম মঠের বাড়িটার দিকে—যেদিকে এই কিছুক্ষণ আগেই নিশিকান্তবাবু গেছেন। পিছন দিকটায় ক্রমে ভিড় হাল্কা হয়ে এসেছে। দু'একজন ভীষণ বুড়ো লামাকে দেখলাম ঘরের দরজার চৌকাঠে বসে আপন মনে প্রেয়ার-হুইল ঘুরিয়ে চলেছে, তাদের মুখের চামড়া এত কুঁচকোন যে দেখলে মনে হয় অন্তত একশো বছর বয়স হবেই। এদের বেশির ভাগেরই গোঁফদাড়ি কামানো, কিন্তু এক-একজনের দেখলাম নাকের নীচে গোঁফ না থাকলেও, ঠোঁটের দুপাশে সরু ঝোলা গোঁফ রয়েছে—যেমন কোনো কোনো চীনেদের থাকে।

পর্দার পিছন দিক দিয়ে গিয়ে আমরা মনাস্টেরির দালানের বারান্দায় পেঁছালাম। দেয়ালে বোধহয় বুদ্ধের জীবনী থেকেই নানারকম ঘটনার ছবি আঁকা রয়েছে। বারান্দার পিছনে অন্ধকার হলঘর রয়েছে, তার মধ্যে সারি সারি প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড লাল কাঠের দরজা দিয়ে এই ঘরে ঢুকতে হয়।

আশেপাশে প্রহরী জাতীয় কেউ নেই দেখে আমরা দুজনে চৌকাঠ

পেরিয়ে হলঘরে ঢুকলাম। স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা ঘর। অদ্ভুত একটা ধূপের গন্ধ ভরে রয়েছে তাতে। কিন্তু অন্ধকার হলে কী হবে—তার মধ্যেই চারিদিকের রঙীন সাজসজ্জার ঝলসানি ফুটে বেরোচ্ছে—তিন-তলা উঁচু সিলিং থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা আশ্চর্য কাজ করা সব সিল্কের নিশান। ঘরের দুদিকে রঙীন কাপড়ে ঢাকা লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতা রয়েছে, প্রকাণ্ড গোল ঢাকের মতো কয়েকটা জিনিস খুঁটিতে দাঁড় করানো রয়েছে। আর পিছন দিকের সবচেয়ে অন্ধকার অংশটায় লম্বা বেদীতে বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মূর্তি, তার কোনটা বুদ্ধ আর কোনটা বুদ্ধ না সেটা আমার পক্ষে বোঝা ভারী মুশাকল।

কাছে গিয়ে দেখলাম এইসব বড় বড় মূর্তির পায়ের কাছে আরো অনেক ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে, নানারকম ফুলদানিতে ফুল রয়েছে, আর ছোট ছোট পেতলের পিদিমে আগুন জ্বলছে।

এইসব জিনিস খুব মন দিয়ে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ ফেলুদা আমার পিঠে হাত দিল। ঘুরে দেখি ও দরজার দিকে চেয়ে রয়েছে। এটা সামনের মেন গেট নয়, পাশের একটা ছোট দরজা।

'বাইরে আয়।'

দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা বলে ফেলুদা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখি ডান দিকে ওপরে যাবার সিঁড়ি রয়েছে।

'কোনদিকে গেল লোকটা জানি না; তবে চান্স নেওয়া ছাড়া গতি নেই।'

'কোন লোকটা?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফিস্‌ফিসিয়ে জিগ্যেস করলাম।

'লাল পোশাক। দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিচ্ছিল। আমি চাই-তেই সট্‌কালো।'

'মুখটা দেখনি?'

'আলো ছিল না।'

দোতলায় উঠে দেখি সামনে একটা ঘর রয়েছে, তার দরজা বন্ধ। এটাতেই কি সেই হাই পোজিসনের লামা থাকেন নাকি? বাঁ-দিকে খোলা ছাত, এখানে ওখানে নিশান ঝুলছে। একতলা থেকে নাচের বাজনার শব্দ আসছে—ভোঁ ভোঁ ভোঁ ঝ্যাং ঝ্যাং ঝ্যাং। এদের নাচ নাকি একবার শুরু হলে সাত আট ঘণ্টার আগে থামে না।

আমরা ছাত দিয়ে হেঁটে উলটো দিকের পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। পিছনে পাহাড়ের দৃশ্য আবছা কুয়াশায় ক্রমে ঢেকে আসছে।

ডান দিকের মঠের পিছন দিয়ে খাড়াই পাহাড় উঠে গেছে, তার উপর দিকটায় দেখলাম একজায়গায় অনেকগুলো বাঁশের খুঁটিতে একসঙ্গে অনেকগুলো ভূত-তাড়ানো নিশান আস্তে আস্তে কুয়াশার পিছনে লুকিয়ে যাচ্ছে।

'শেলভাঙ্কারের ছেলে যদি এখানে—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একটা বিকট চীৎকারে আমরা দুজনেই চমকে থ মেরে গেলাম।

'ওরে বাবা—ওঃ! হেল্প! হেল্প!'

এ যে নিশিকান্তবাবুর গলা!

আর কিছু ভাববার আগেই ফেলুদা দেখি দৌড় দিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে বেরিয়ে মঠের পিছন দিকের দরজা খুঁজে বার করতে সময় লাগল এক মিনিটেরও কম। দরজার বাইরে বেরিয়ে দেখি দশ হাতের মধ্যেই পাহাড় খাড়াই উঠে গেছে। হান্টিং বুট আজও পায়ে ছিল, তাই উঠতে কোন অসুবিধা হল না। কোনদিকে যেতে হবে সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি, কারণ হেল্প হেল্প চীৎকারটা এখনো আমাদের হেল্প করছে।

খানিকদূর উঠে একটা ফ্ল্যাট জায়গা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে যেখানে পৌঁছলাম সেটা পাহাড়ের কিনার। তারপরেই খাদ, তবে সে খাদ বেশি দূর নামেনি—বড় জোর একশো ফুট। আর তাও ধাপে ধাপে। এরই একটা ধাপে—বোধহয় দু'হাতের বেশি চওড়া নয়—একটা গাছ-ড়াকে আঁকড়ে ধরে ঠিকরে বেরিয়ে-আসা চোখ উপরের দিকে করে ঝুলে আছেন নিশিকান্ত সরকার। আমাদের দেখেই ভদ্রলোক দ্বিগুণ জোরে চীৎকার করে উঠলেন—মরে গেলুম। বাঁচান!

নিশিকান্তবাবুকে উদ্ধার করা ফেলুদার পক্ষে এমন একটা কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, তাঁকে জাপটে ধরে টেনে তোলামাত্র ভদ্রলোক চোখ উলটে ভিরমি দিলেন। অবিশ্যি জীপে এনে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এলো।

'কী ব্যাপার বলুন ত'—ফেলুদা জিগ্যেস করল।

নিশিকান্তবাবু কোঁকানির সুরে বললেন, 'আরে মশাই কী আর বলব—এই এতখানি পথ—একটু হাল্কা হবার দরকার পড়েছিল —তা ধর্মস্থান অ—মানস্—মানে যাকে বলে মনাস্ট্রি—তাই ভাবলুম পেছন দিকটায় গিয়ে দেখি—ঝোপঝাড়ের ত অভাব নেই—তা জায়গাও পেলুম সুটেব্‌ল—কিন্তু আমাকে যে আবার ফলো করেছে তা কী করে জানব বলুন!'

'পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারল?'

'সেন্ট পারসেন্ট। কী সাং—মানে সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন ত!

নেহাৎ হাতের কাছে একটা গাছ পেলুম বলে—নইলে তিব্বতী শাস্ত্র, মানে, অক্ষরে অক্ষরে—'

'লোকটাকে দেখেছেন?'

'পেছন দিক থেকে এসে ধাক্কা মারলে আবার দেখা যায় নাকি-হেঃ!'

এই দুর্ঘটনার পর রুমটেকে থাকার আর কোনো মানে হয় না—হয়ত নিরাপদও নয়—তাই আমরা আবার বাড়িমুখো রওনা দিলাম। হেলমুটের একটু আপসোস হল, কারণ ও বলল ছবি তোলার এত ভালো সাবজেক্ট ও এসে অবধি আর পায়নি। তবে নাচ আগামী-কালও হবে, তাই ইচ্ছে করলে আরেকবার আসতে পারে।

ফেলুদা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল—বোধহয় চিন্তা করছিল—কারণ ঘটনা এত দ্রুত ঘটে চলেছে, ওর মতো পরিষ্কার মাথাও হয়ত গুলিয়ে আসছিল। এবার সে নিশিকান্তবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মশাই, আপনার একটা দায়িত্ব আছে সেটা বোধহয় বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছেন।'

'দায়িত্ব?' ভদ্রলোকের গলা দিয়ে যেন পুরো আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

'আপনি কার পিছনে লেগেছেন সেটা না বললে ত কে আপনার পিছনে লেগেছে সেটা বলা যাবে না।'

নিশিকান্তবাবু ঢোক গিলে দু'হাত তুলে কান মলে বললেন, 'কী সাক্ষী করে বলতে হবে বলুন—আমি বলছি—জ্ঞানত আমি কোনো লোকের কোনো অনিষ্ট করিনি—কারুর পেছনে লাগিনি—এমন কি কারুর বদনাম পর্যন্ত করিনি।'

'আপনার কোনো যমজ ভাইটাই নেই ত?'

'আজ্ঞে না স্যার। আই অ্যাম ওনলি অফ্‌স্প্রিং।'

'হুঁ...। মিথ্যে বললে অবিশ্যি আপনিই ঠকবেন। কাজেই ধরে নিচ্ছি আপনি সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু...'

ফেলুদা চুপ করে গেল। আর সেই যে চুপ করল, সে একেবারে ডাকবাংলো পর্যন্ত।

ডাকবাংলোতে এসে হেলমুট গাড়ি থেকে নেমে জীপের ভাড়ার শেয়ার দিতে যাওয়াতে ফেলুদা বাধা দিল। 'তোমাকে ত আমরাই ইনভাইট করেছি, আর তুমি আমাদের দেশে অতিথি—কাজেই তোমার পয়সা ত আমরা নেব না।'

'অল রাইট—হেলমুট হেসে বলল, 'তাহলে একটু বসে চা খেয়ে যাও।'

নিশিকান্তবাবুরও আপত্তি নেই দেখে আমরা তিনজনেই জীপটাকে পাওনা চুকিয়ে ছেড়ে দিয়ে বাংলোয় হেলমুটের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

তিনজনে চেয়ারে বসেছি। হেলমুট ঘাড় থেকে ক্যামেরা নামিয়ে টেবিলের উপর রেখে চায়ের অর্ডার দিতে যাবে, এমন সময় একটা আওয়াজ পেয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখি একজন অদ্ভুত দেখতে ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে হেলমুটের দিকে চেয়ে হেসে হ্যালো বললেন। ভদ্রলোকের মুখে কাঁচাপাকা চাপ দাড়ি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল প্রায় কাঁধ অবধি নেমেছে, গায়ের উপর দিকে একটা গলাবন্ধ ঢলঢলে অরেঞ্জ রঙের সিকিমি জ্যাকেট, আর তলার দিকে ঢিলে ফ্ল্যানেলের পাৎলুন। তার হাতে একটা বেশ বড় হলদে লাঠিও রয়েছে—যাকে বোধহয় বলে যষ্ঠি।

হেলমুট আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই—ইনিই ডক্টর বৈদ্য।'

৭

'আপনাদের দেখিয়ে বঙ্গালি মনে হতেছে।'

ডাক্তার বৈদ্য ঠিক আমার পাশের চেয়ারটায় বসলেন।

ফেলুদা বলল, 'ঠিকই বলেছেন।...আপনার কথা আমরা আগেই হেলমুটের কাছে শুনেছি।'

'হেলমুট ইজ এ নাইস বয়।'

ভদ্রলোক ইংরিজি বাংলা হিন্দি তিনরকম ভাষা মিশিয়ে কথা বলে গেলেন।

'তবে হেলমুটকে আমি বলেছি যে এদেশের একটা সংস্কারের কথা ও যেন না ভোলে। এরা বিশ্বাস করে যে যার যত বেশি ছবি তোলা হবে, তার তত বেশি আয়ু কমে যাবে। কারণ, এই যে আমি,এই আমার খানিকটা যদি অন্য কোনো বস্তুতেও থেকে থাকে, তার মানে আমার ভাইটাল ফোর্সের খানিকটাও নিশ্চয়ই সেই অন্য বস্তুর মধ্যে রয়েছে। এবং সেই পরিমাণে আমার নিজের ভাইটাল ফোর্সও নিশ্চয়ই কমে যাচ্ছে।'

'আপনিও কি এতে বিশ্বাস করেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'করলেই বা কী?' ডক্টর বৈদ্য হেসে বললেন। 'হেলমুট কি আর আমার ছবি তুলতে বাদ রেখেছে? তবে কোনো জিনিস পরীক্ষা করে দেখার আগে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটা ওঠে না। এখনো অনেক জিনিস শিখতে বাকি আছে, অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক পরীক্ষা করতে হবে।'

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু আপনি ত সে সব না করেই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয়। শুনলাম আপনি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন।'

'সব সময় না।' বৈদ্য একটু মুচকি হাসলেন। 'পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কিছু জিনিস খুব সহজে বলে দেওয়া যায়। যেমন—' বৈদ্য নিশিকান্তবাবুর দিকে আঙুল দেখালেন '—ওই ভদ্রলোকটি কোনো কারণে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।'

নিশিকান্তবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। ওকে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি মৃত্যুভয় দেখাচ্ছেন। সেটা কে বলতে পারেন?'

ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করলেন। তারপর চোখ খুলে জানালা দিয়ে বাইরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এজেন্ট।'

'এজেন্ট?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, এজেন্ট। মানুষ অন্যায় করলে তার শাস্তি হবেই। অনেক সময় ভগবান নিজেই শাস্তি দেন, আবার অনেক সময় তাঁর এজেন্টরা এই কাজটা করে।'

নিশিকান্তবাবু হঠাৎ কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, 'দ্যাট ইজ অল। আমি আর শুনতে চাই না।'

বৈদ্য হেসে বললেন, 'আমি জোর করে কাউকে কিছু শোনাই না। ইনি জিগ্যেস করলেন, তাই বললাম। স্বেচ্ছায় লব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। তবে একটা কথা বলতে চাই— বাঁচতে হলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।'

'কাইন্ডলি এক্সপ্লেন', বললেন নিশিকান্তবাবু।

'এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

চা এসে গিয়েছিল। হেলমুট নিজেই চা ঢেলে সবাইকে জিগ্যেস করে দুধ চিনি মিশিয়ে আমাদের হাতে হাতে পেয়ালা তুলে দিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আপনাদের সঙ্গে ত মিস্টার শেলভাঙ্কারের আলাপ হয়েছিল।'

বৈদ্য মাথা নেড়ে বলল, 'বড় দুঃখের ব্যাপার। আমি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে ওর সময়টা ভালো যাচ্ছে না। অবিশ্যি অকস্মাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে ত কারুর কোনো হাত নেই। দোরোম পোরোবিংচিতেত বলেইছে—

হ্রেম দোরমোং দোরজি সিংচিয়াম্
ওম্ পিরিয়ান হোতোরিবিরিচিয়াং!'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে চা খেলাম। হেলমুট এই ফাঁকে তার টেবিলটা গোছগাছ করে নিল। নিশিকান্তবাবু চায়ের পেয়ালা হাতে করে বসে আছেন—বুঝতে পারছি তাঁর চা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে —কিন্তু খাবার কথাটা তাঁর যেন মনেই আসছে না। এর মধ্যে নিশ্চিন্ত দেখলাম ফেলুদাকে। কিম্বা তার মনে উদ্বেগ থাকলেও সেটা সে একেবারেই বাইরে প্রকাশ করছে না, দিব্যি একটার পর একটা বিস্কুট খেয়ে চলেছে।

বাইরে রোদ পড়ে আসছে। হেলমুট সুইচ টিপল, কিন্তু বাতি

জ্বলল না। কী ব্যাপার? নিশিকান্তবাবু বললেন, 'পাওয়ার গেছে। এটা প্রায়ই ঘটে।'

'বেয়ারাকে মোমবাতি দিতে বলি' বলে হেলমুট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার ফেলুদা ডক্টর বৈদ্যকে আরেকটা প্রশ্ন করল।

'মিস্টার শেলভাঙ্কারের মৃত্যু কি সত্যি আকস্মিকভাবে হয়েছিল বলে আপনার বিশ্বাস?'

ডক্টর বৈদ্য হাতের পেয়ালা সামনের বেতের টেবিলের উপর রেখে হাত দুটোকে পেটের উপর জড়ো করে বললেন, 'এ কথার উত্তর ত শুধু একজনই দিতে পারে।'

'কে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'যে মৃত—একমাত্র সে-ই সর্বজ্ঞ। তারই কাছে অজানা কিছু নেই। আমাদের জীবিতকালে অজস্র অবান্তর জিনিস আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। ওই যে জানালা খোলা রয়েছে—সে জানালা দিয়ে আমরা দূরের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, আকাশ দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের গায়ে গাছপালা বাড়িঘর সব দেখতে পাচ্ছি, আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। এসব হল অবান্তর জিনিস—নির্ভেজাল জ্ঞানের পথে এসব দৃশ্যবস্তু বাধাস্বরূপ। অথচ জানালা যদি বন্ধ করে দিই তাহলে কী দেখব? ঘরে যদি আলো না থাকে, তাহলে বাইরের আলোর পথ বন্ধ করে দিলে কী থাকে? অন্ধকার। জীবন হল আলো, আর জীবন হল ওই জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্য, যা আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আর মৃত্যু হল বন্ধ জানালার ফলে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। এই অন্ধকারের ফলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। মৃত্যুই হল অন্ধকারের চরম অবস্থা।'

এত বড় বক্তৃতা একটানা শুনে একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু ভরসা ছিল যে ফেলুদা নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছে। ও বলল, 'তাহলে আপনার মতে মিস্টার শেলভাঙ্কারই একমাত্র জানেন তাঁর মৃত্যু কী ভাবে হয়েছিল?'

'মৃত্যুর মুহূর্তটিতে হয়ত জানত না—কিন্তু এখন নিশ্চয়ই জানে।'

কেন বলতে পারি না—আমার একটু গা ছমছম করতে শুরু করেছিল। হয়ত অন্ধকার বেড়ে আসছে বলেই; আর মৃত্যুটিত্যু নিয়ে এত কথাবার্তা, আর ডক্টর বৈদ্যর চশমার কাঁচে বেগুনী মেঘে ভরা আকাশের ছায়া, আর তাঁর অস্বাভাবিক রকম কাঁপা কাঁপা গলার স্বর, এমন কি তাঁর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটাও কেমন জানি থম-

থমে মনে হচ্ছিল।

বেয়ারা ঘরে এসে চায়ের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে তার জায়গায় টেবিলের উপর একটা জ্বালানো মোমবাতি রেখে চলে গেল। ফেলুদা সবাইকে চারমিনার অফার করল, আর সবাই রিফিউজ করল। তখন ও একাই একটা সিগারেট ধরিয়ে পর পর দুটো রিং ছেড়ে বলল—'মিস্টার শেলভাঙ্কারের মতামতটা জানতে পারলে মন্দ হত না।'

ফেলুদা অবিশ্যি প্ল্যানচেট ট্যানচেট নিয়ে বই পড়েছে। ও বলে যে জিনিসে বিশ্বাস নেই—সেই নিয়ে বইও পড়া উচিত না—এ কথাটা আমি মানি না। কারণ, যে বইটা লিখেছে, তার মতামতটা জানা মানে মানুষের চিন্তাধারার একটা বিশেষ দিক সম্বন্ধে জানা। ক্রাইম নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করবে, তাদের মানুষ সম্বন্ধে জানতেই হবে, আর মানুষ বলতে সবরকম মানুষই বোঝায়, কাউকেই বাদ দেওয়া চলে না।

ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন, হঠাৎ চোখ খুলে হাত দুটো উপরে তুলে বললেন, 'দরজা এবং জানালা দুটো বন্ধ কর।'

কথাটা বললেন, হুকুম করার ভঙ্গিতেই, আর সে হুকুম পালন করলেন নিশিকান্তবাবু। মনে হল তিনি যেন হিপ্নোটাইজড্ হয়ে প্রায় যন্ত্রের মানুষের মতো কাজটা করলেন।

জানালা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতির আবছা হলদে আলো ছাড়া ঘরে আর কোনো আলোই রইল না।

আমরা সবাই বেতের টেবিলটাকে ঘিরে বসেছিলাম। আমার ডান পাশে বৈদ্য, বাঁ পাশে ফেলুদা। ফেলুদার অন্য পাশে নিশিকান্ত-বাবু। আর তার পাশে একটা মোড়ায় হেলমুট। ডক্টর বৈদ্য এবার বল-লেন, 'তোমাদের হাতগুলো উপুড় করে টেবিলের উপর রাখ। প্রত্যেকের হাত তার দু'পাশের লোকের হাতের সঙ্গে ঠেকে থাকা চাই।'

ডক্টর বৈদ্য এতক্ষণ আমাদের 'আপ' আর 'আপনি' বলে বল-ছিলেন, এবার দেখলাম 'তুম' আর 'তুমি' আরম্ভ করলেন।

আমরা একে একে সবাই পরস্পরের সঙ্গে হাত ঠেকিয়ে টেবিলে রাখলাম। সব শেষে ডক্টর বৈদ্য আমার আর হেলমুটের হাতের মাঝ-খানে তাঁর নিজের হাত দুটো গুঁজে দিলেন। পাঁচ দশে পঞ্চাশটা উপুর করা হাতের আঙুল এখন ফুলের পাপড়ির মতো মোমবাতি-টাকে গোল করে ঘিরে বেতের টেবিলের উপর রাখা হয়েছে।

'তোমরা সবাই একদৃষ্টে মোমবাতির শিখার দিকে চেয়ে শেল-ভাঙ্কারের মৃত্যুর কথা চিন্তা কর।'

ঘরে বাতাস ঢোকার কোনো রাস্তা নেই, তাই মোমবাতির শিখা একেবারে স্থিরভাবে জ্বলছে। অল্প অল্প করে মোম গ'লে বাতির গা বেয়ে গড়িয়ে বেতের বুনুনির ওপর জমা হচ্ছে। একটা ফড়িং

জাতীয় পোকা ঘরের ভিতর ছিল, সেটা বাতির শিখার চারিদিকে পাক খেতে আরম্ভ করল।

কতক্ষণ যে এইভাবে বাতির দিকে চেয়েছিলাম জানি না। সত্যি বলতে কী দু'একবার যে আড়চোখে ডক্টর বৈদ্যর দিকে চেয়ে দেখিনি তা নয়—কিন্তু সেটা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি, কারণ তাঁর চোখ বন্ধ।

হঠাৎ—যেন অনেক দূর থেকে গলার স্বর আসছে—এইভাবে চিঁ চিঁ করে ডক্টর বৈদ্যর মুখ থেকে কথা বেরোল—'হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট টু নো?'

ফেলুদা বলল, 'শেলভাঙ্কার কি অ্যাক্সিডেণ্টে মরেছিল?'

আবার সে চিঁচিঁ গলায় উত্তর এলো—'নো'।

'তাহলে কীভাবে মরেছিলেন তিনি?'

কিছুক্ষণ সব চুপ। এখন আমরা সবাই মোমবাতি ছেড়ে ডক্টর বৈদ্যর মুখের দিকে চেয়ে আছি। তাঁর চোখ বন্ধ, মাথা পিছন দিকে হেলান। হেলমুট দেখলাম তার নীল নিষ্পলক চোখে ডক্টর বৈদ্যকে দেখছে। নিশিকান্তবাবুর কুতকুতে চোখও তাঁরই দিকে।

ঘরে হঠাৎ এক ঝলক নীল আলো। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

এবার আরো পরিষ্কার গলায় উত্তর এলো—

'মার্ডার।'

'মার্ডার!' এটা নিশিকান্তর গলা—শুকিয়ে খস্‌খসে হয়ে গেছে। কথাটা একটানা বলতে পারলেন না তিনি। বললেন, 'মা-হা-হারা-ডার!'

'কে খুন করেছিল বলা সম্ভব কি?' আবার ফেলুদাই প্রশ্ন করল।

আমার বুকের ভিতরে অসম্ভব ঢিপঢিপানি আরম্ভ হয়েছে। নিশিকান্তবাবুর মতো আমারও গলা শুকিয়ে এসেছে। নেহাৎ কথা বলতে হচ্ছে না বলে, না হলে আমিও ধরা পড়ে যেতাম।

আবার কিছুক্ষণের জন্য সব চুপ। ফেলুদা দেখলাম একদৃষ্টে ডক্টর বৈদ্যর হাতের দিকে দেখছে। ভদ্রলোক কয়েকবার খুব জোরে জোরে—যেন বেশ কষ্ট করে—নিশ্বাস নিলেন। তারপর উত্তর এলো—

'বীরেন্দ্র।'

বীরেন্দ্র? সে আবার কে?

ফেলুদাও নিশ্চয়ই এটা জানতে চাইত, কিন্তু ডক্টর বৈদ্য হঠাৎ তাঁর হাত দুটো টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চোখ খুলে বললেন, 'এ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লীজ।'

হেলমুট মোড়া থেকে উঠে গিয়ে তার টেবিলের উপর রাখা ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে জল ঢেলে বৈদ্যকে দিল। ভদ্রলোকের জল খাওয়া শেষ হলে পর ফেলুদা বলল 'বীরেন্দ্র যে কে সেটা বোধহয় জানার

কোনো সম্ভাবনা নেই?'

উত্তর এলো হেলমুটের কাছ থেকে।

'বীরেন্দ্র মিস্টার শেলভাঙ্কারের ছেলের নাম। আমাকে বীরেন্দ্রর কথা বলেছেন তিনি। একবার নয়—অনেকবার।'

জানালা খুলে দিতে গিয়ে দেখি বাইরে ইলেকট্রিকের আলো দেখা যাচ্ছে। হেলমুটও বোধহয় দেখেছিল, কারণ ও সুইচ টিপে দিল, আর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। ঘড়িতে দেখি পৌনে সাতটা। আমরা সকলেই উঠে পড়লাম।

ডক্টর বৈদ্য নিশিকান্তবাবুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আপনাকে খুব নার্ভাস লোক বলে মনে হচ্ছে।'

নিশিকান্তবাবু একটু হেঁ হেঁ করলেন।

'যাক্‌গে', ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'মনে হয় আপনার ফাঁড়া কেটে গেছে।'

ওঃ!' আহ্লাদে হাঁফ ছেড়ে নিশিকান্তবাবু তাঁর সব ক'টা দাঁত বার করে দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ক'দিন আছেন?'

ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'কাল দিনটা ভালো থাকলে পেমিয়াংচি যাবার ইচ্ছে আছে। ওখানকার মনাস্টেরিতে অনেক ভালো পুঁথিপত্র আছে শুনেছি।'

'আপনি কি তিব্বত নিয়ে পড়াশুনা করছেন?'

প্রাচীন সভ্যতা বলতে ত ওই একটি বাকি আছে। মিশর, ইরাক, মেসোপটেমিয়া—এ সব ত বহুকাল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে কী আছে বলুন। সবই পাঁচমেশালি। যা ছিল তিব্বতেই ছিল—একেবারে খাঁটি অবস্থায়—এই সেদিনও পর্যন্ত। এখন ত আর তিব্বতে যাবার কোনো মানে হয় না। সৌভাগ্যক্রমে এই সিকিমের মঠগুলোতে সেই পুরোন সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।'

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাত্রে নির্ঘাৎ বৃষ্টি হবে। আকাশ কালো, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক।

ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'আপনারাও এসে পড়ুন না পেমিয়াংচি।'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক কালই যেতে পারব বলে মনে হয় না। আপনি ত কয়েক দিন থাকবেন ওখানে?'

'অন্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে আছে।'

'তাহলে হয়ত দেখা হতে পারে, কারণ পেমিয়াংচির কথা অনেকেই বলছে।'

'গেলে কিছু নুন সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।' ডক্টর বৈদ্য হেসে বললেন। 'নুন?'

'জোঁক ছাড়াতে হলে নুন ছাড়া গতি নেই!'

৮

আমাদের হোটেলটা অন্যদিক দিয়ে খুব একটা কিছু না হলেও, রান্নাটা এখানে বেশ ভালোই হয়—বিশেষ করে পাঁঠার মাংসের ঝোল। আমি আর ফেলুদা দুজনেই রাত্রে রুটি খাই, আর নিশিকান্তবাবু দু'বেলাই খান ভাত। আজ তিনজনে এক সঙ্গে খেতে বসেছি। নিশিকান্তবাবু একটা নলি হাড় চুষে চোঁ করে ম্যারো বার করে খেতে খেতে বললেন, 'ডিসেণ্ট লোক মশাই।'

'ডক্টর বৈদ্যর কথা বলছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আশ্চর্য ক্ষমতা। কিরকম সব বলে বলে দিলে।'

ফেলুদা হেসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'আপনার ত ভালো লাগবেই—বলেছে ফাঁড়া কেটে গেছে—আর কী চাই!'

'আপনার বুঝি ওঁর কথাগুলো বিশ্বাস হয় না?'

'কথাগুলো যদি ফলে যায় তাহলে হবে নিশ্চয়ই। এখনো ত সে স্টেজে পেঁছয়নি। এমনিতে এসব লোকের উপর চট্ করে শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন। এক বুজরুকের দল আছে এ লাইনে।'

কিন্তু সত্যি করে গুণী লোকও ত থাকতে পারে। এঁর কথাবার্তার স্টাইলই আলাদা। শুনলেই ইম্প্রেস্ড হতে হয়। আর যদি ধরুন গিয়ে মার্ডার হয়েই থাকে...'

ফেলুদা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল; কেন, সেটা বুঝতে পারলাম না। হয়ত মনের মধ্যে কোনো খট্কা রয়েছে। এত ভালো মাংস খাবার সময়ও তার চোখ থেকে ভ্রূকুটি যেতে চাইছে না।

'মার্ডারের কথা যে বললে, সেটা আপনার বিশ্বাস হয়?' নিশি-কান্তবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'হয়।'

'হয়?'

'হয়।'

'কেন বলুন ত।'

'কারণ আছে।'

এর বেশি আর ফেলুদা কিছু বলল না।

খাবার পরে কালকের মতই দুজনে পান কিনতে বেরোলাম। বৃষ্টি এখনো নামেনি, তবে বাতাস একদম বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে দু-একজন নতুন মুখকে হাঁটতে দেখলাম। তারা সবাই বিদেশী, বোধহয় আমেরিকান। এসব বিদেশী টুরিস্টরা সাধারণত এসে নরখিল বলে একটা হোটেলে থাকে; ওটাই এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেল।

ফেলুদা পান খেয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে আরম্ভ করেছিল, হঠাৎ থেমে বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কিছু ক্যালকুলেশন আছে, সেরে ফেলি গে। তুই বরং এক কাজ কর। কাছাকাছির মধ্যে একটু ঘুরে আয়। আমি আধঘণ্টা আন্‌ডিস্‌টার্বড কাজ করতে চাই।'

ফেলুদা হোটেলে ফিরে গেল। ওর কাজে ব্যাঘাত করার ইচ্ছে বা সাহস কোনটাই আমার নেই—বিশেষ করে তদন্তের এই জটপাকানো অবস্থায়।

দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক নেই বেশি। হোটেলের কাছেই একটা বন্ধ দোকানের সামনে কয়েকটা নেপালী গোল হয়ে বসে জুয়া খেলছে। মাঝে মাঝে ঘুঁটি নাড়ার শব্দ আর তাদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

আমি শহরের দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। এখনো বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর তার সঙ্গে অনেক দূর থেকে মেঘের গর্জন। তবে মনে হয় না বৃষ্টি খুব শিগ্‌গির আসবে। ধীরে ধীরে তোড়জোড় চলেছে, নামবে গিয়ে হয়ত সেই মাঝ রাত্রে।

রাস্তার বাতিগুলোর খুব জোর নেই, আর উপর দিক থেকে পড়ে বলে চেনা লোকের মুখও চিনতে সময় লাগে।

উল্টো দিক থেকে কে যেন আসছে। এখনো প্রায় বিশ-ত্রিশ গজ দূরে। এবার একটা আলোর তলায় এসে পড়াতে মাথার ব্রাউন চুলটা চক্‌চক্‌ করে উঠল।

পরের আলোটায় পরিষ্কার চিনতে পারলাম হেলমুটকে। সে অন্যমনস্ক ভাবে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটছে।

এখন দশ হাতের মধ্যে হেলমুট। তার ভুরু কুঁচকোন, হাত দুটো প্যান্টের পকেটে গোঁজা।

হেলমুট আমার পাশ দিয়ে গটগটিয়ে হেঁটে চলে গেল, অথচ আমাকে যেন দেখতেই পেল না।

আমি মুখ ঘুরিয়ে হতভম্বভাবে কিছুক্ষণ ওর ক্রমে-ছোট-হয়ে-যাওয়া চেহারাটার দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে হোটে-লের দিকে রওনা দিলাম।

ঘরে এসে দেখি ফেলুদা বুকের ওপর খাতা খুলে চিত হয়ে খাটে শুয়ে আছে। বললাম, 'আধঘণ্টা হয়ে গেছে ফেলুদা।'

ফেলুদা বলল, 'সাসপেক্টের তালিকাটা আপ-টু-ডেট করে ফেললাম।'

আমি বললাম, 'বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার যে সাসপেক্ট সেটা ত আগেই জানতাম, শুধু নামটা জানা ছিল না। ডক্টর বৈদ্যও কি সাসপেক্ট?'

ফেলুদা একটু হেসে বললে, লোকটা ভেল্কি দেখিয়েছে ভালোই। অবিশ্যি, এমন ভেল্কি যে সম্ভব নয় তা বলছি না। আর আজকের ব্যাপারে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে, বৈদ্যর শেল-ভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শেলভাঙ্কার ওকে কী বলেছিল না-বলেছিল সেটা না জানা অবধি বৈদ্য ভণ্ড-বৈদ্য না খাঁটি-বৈদ্য সেটা জানা যাবে না।'

'কিন্তু নিশিকান্তবাবুর ব্যাপারটা যে বলে দিল।'

'জলের মত সোজা। নিশিকান্ত যে-রেটে নখ কামড়াচ্ছিল, তার নার্ভাসনেস বুঝতে অলৌকিক ক্ষমতার দরকার হয় না।'

'আর মার্ডার?'

'মার্ডার না বলে স্বাভাবিক মৃত্যু বললে নাটক জমে না। লোকটা এসেনসিয়ালি নাটুকে। অনেকগুণী লোকই নাটুকে হয়, অভিনয় পছন্দ করে, লোককে চমক দিতে ভালোবাসে। এটা মানুষের অনেক-গুলো স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে একটা।'

'তাহলে সাস্‌পেক্ট কাকে কাকে বলতে হয়?'

'যথারীতি সকলকেই।'

'ডক্টর বৈদ্যও?'

'হোয়াই নট? মূর্তির কথাটা ভুলিস না।'

'আর হেলমুট?' আমি হেলমুটের ঘটনাটা বললাম।

ফেলুদা কিন্তু খুব বেশি অবাক হল না। বলল, 'হেলমুটও যে রহস্যময় চরিত্র সেটা আমি আগেই বুঝেছি। ও বলছে প্রোফেসনাল ফোটোগ্রাফার, সিকিম সম্বন্ধে একটা ছবির বই করছে, অথচ রুমটেকে যে এত বড় একটা উৎসব হচ্ছে, সে খবরটা সে জানত না। এখানেই ত খট্‌কার কারণ রয়েছে।'

'তার মানে কী হতে পারে?'

'তার মানে এই যে ওর এখানে থেকে যাওয়ার অন্য কোনো একটা কারণ রয়েছে যেটা ও আমাদের কাছে প্রকাশ করছে না।'

ফেলুদা আরো কিছুক্ষণ ধরে খাতায় হিজিবিজি লিখল। আমি আকাশ-পাতাল ভেবেও এই সব ঘটনার জট ছাড়াতে পারলাম না। আমরা এর আগেও অদ্ভুত সব রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু

কোনটারই সমাধান এত কঠিন বলে মনে হয়নি। একবার মনে হল ফেলুদার পুলিসে খবর দেওয়া উচিত। ও একা কেন সমস্ত ব্যাপারটা ঘাড়ে নিচ্ছে? শেলভাঙ্কারকে যে-ই খুন করুক না কেন, সে যে একটা ডাকসাইটে ক্রিমিন্যাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদি সেই লোক ফেলুদার তদন্তের কথা জেনে ফেলে, আর ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে? কিন্তু তার পরেই আবার মনে হল, পুলিস যদি ফেলুদার আগে খুনীকে ধরে ফেলে, তাহলে সেটা আমার মোটেই ভালো লাগবে না। তার চেয়ে ফেলুদা যা করছে তা একাই করুক। যদি ও এই কঠিন রহস্যের সমাধান করতে পারে, তাহলে ওর গৌরব পঞ্চাশ গুণ বেড়ে যাবে।

পৌনে এগারটার সময় নিশিকান্তবাবু দরজায় টোকা মেরে গুড নাইট করে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ গল্পের বইটা পড়ার চেষ্টা করলাম। জুল ভার্নের কার্পেথিয়ান কাস্‌ল। জানি খুব ইণ্টারেস্টিং বই, কিন্তু তাও মন বসল না। কিছুক্ষণ পরে বই বন্ধ করে চোখ বুজলাম। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখেছি ফেলুদা তার খাতায় নোট করে চলেছে।

মনে যত দুশ্চিন্তাই থাকুক না কেন—রাত্রে একবারও ঘুম ভাঙেনি। সকালে যখন উঠেছি, তখন জানালা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে রোদ দেখা যাচ্ছে। ফেলুদা ঘরে নেই—বোধহয় স্নান করতে গেছে।

যেখানেই যাক্‌—যাবার আগে তার খাটের উপর একটা সাদা কাগজ অ্যাশ-ট্রে চাপা দিয়ে রেখে গেছে—বোধহয় আমারই দেখার জন্য।

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে আমাদের চেনা একটা তিব্বতী কথা—যার মানে হল মৃত্যু।

৯

আসলে ফেলুদা বাথরুমে যায়নি। ও খুব ভোর থাকতে উঠে নীচে চলে গিয়েছিল একটা টেলিফোন করতে। বম্বেতে ট্রাঙ্ক-কল। আমি স্নান-টান সেরে নীচে গিয়ে দেখি ফেলুদা টেলিফোনে কথা বলছে। শেষ হলে পর জিগ্যেস করলাম, 'কী ব্যাপার?' ও বলল, 'শশধরবাবু বম্বেতে নেই। আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছেন। বোধহয় এখানেই আসছেন। আমার আগের টেলিগ্রামটাতে হয়ত কাজ হয়েছে।'

চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, 'আজ একটা এক্সপেরিমেণ্ট করব। মনে হচ্ছে একটা ব্যাপারে একটু ছেলেমানুষী করে ফেলেছি। সেটা সত্যি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

এক্সপেরিমেণ্টটা কী সেটা আর আগে থেকে জিগ্যেস করতে সাহস হল না। কোথায় সেটা হবে জিগ্যেস করাতে ফেলুদা বলল তার জন্য একটা নিরিবিলি জায়গা চাই। নিরিবিলি ঘর হলে হবে কিনা জিগ্যেস করাতে ফেলুদা চটে গিয়ে বলল, 'তোর মুণ্ডু! ঘর ত হোটেলেই রয়েছে। চাই একটা রাস্তা, যেখানে লোকজনের ভিড় নেই। কারণ লোকে দেখে ফেললে ভাববে পাগল। একবার নাথুলা রোডের দিকটায় গিয়ে দেখতে হবে।'

সত্যি বলতে কি, এই দুদিনে গ্যাংটকের একটামাত্র রাস্তা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেখা হয়নি। তাই একটু হেঁটে বেড়াবার ছুতো পেয়ে ভালোই লাগছিল।

হোটেল থেকে বেরিয়েই ডক্টর বৈদ্যর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রোদের বেশ ঝাঁঝ, তাই ভদ্রলোক দেখি সানগ্লাস পরেছেন। বললেন, 'কোথায় চললেন আপনারা?'

ফেলুদা বলল, 'শহরটা দেখাই হয়নি। ভাবছিলাম একটু ওপর দিকটায় যাবো—প্যালেসের ওদিকে।'

'আমি যাচ্ছি গাড়ির সন্ধানে। আজ দিনটা ভালো আছে। এ গুড ডে টু মেক দ্যাট ট্রিপ টু পেমিয়াংচি। আপনারা না এলে কিন্তু একটা খুব ভালো জায়গা মিস্ করবেন।'

'যাবার ত ইচ্ছে আছে।'

'আমি থাকতে থাকতে চলে আসুন। গ্যাংটক জায়গাটা খুব সুবিধের না। বিশেষ করে আপনার পক্ষে নিরাপদ নয় মোটেই।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে হাত নেড়ে চলে গেলেন।

আমি বললাম, 'হঠাৎ ওকথাটা বললেন কেন ভদ্রলোক?'

ফেলুদা হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুখোড় আছেন বাবাজী। আমি যেমন ওকে সন্দেহ করছি, ও-ও তেমনি উল্টে আমাকে সন্দেহ করছে। হয়ত বুঝে ফেলেছে যে আমি একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ছি।'

'কিন্তু তোমাকে ত সত্যিই হুমকি দিয়ে লিখেছে ফেলুদা। খাটের উপর কাগজটা দেখলাম যে।'

'এটা কি নতুন জিনিস হল'?

'তা অবিশ্যি নয়।'

'তবে! তোর যদি ধারণা হয়ে থাকে যে ওই একটা তিব্বতী কথার জন্য আমি তদন্ত বন্ধ করে দেব, তাহলে তুই ফেলু মিত্তিরকে এখনো চিনিসনি।'

মুখে সেটা না বললেও, মনে মনে বললাম যে যদি কেউ ফেলু মিত্তিরকে চেনে তবে সেটা আমিই। বাদশাহী আংটির ব্যাপারে হুমকি সত্ত্বেও কী সাংঘাতিক বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফেলুদা সেটা ত আমি দেখেছি।

চড়াই রাস্তাটা উঠে ক্রমে ফ্ল্যাট হয়ে গিয়ে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড চওড়া—প্রায় দার্জিলিং-এর ম্যালের মতো—খোলা জায়গায় এসে পড়েছে। সেটার মাঝখানে একটা নীচু রেলিং দিয়ে ঘেরা ফুলের কেয়ারি করা গোল জায়গা রয়েছে। আবার সেটার মাঝখনে একটা হল্‌দে কাঠের পোস্টে এদিকে-ওদিকে পয়েণ্ট করা সব রাস্তা আর জায়গার নাম লেখা ফলক রয়েছে। ডানদিকে যে ফলকটা পয়েণ্ট করা তাতে লেখা রয়েছে 'প্যালেস'। ডান দিকে চেয়ে দেখলাম, দুদিকে গাছের সারিওয়ালা একটা সোজা রাস্তার শেষ মাথায় একটা বাহারের গেট দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম ওটাই হল প্যালেসের গেট।

বাঁদিকে দেখানো ফলকটায় লেখা রয়েছে 'নাথুলা রোড'। আশে পাশে কোন লোকজন নেই। দূরে প্যালেসের রাস্তায় কালকের দেখা বিদেশী টুরিস্টরা ক্যামেরা হাতে পায়চারি করছে। ফেলুদা বলল, 'লক্ষণ ভালই। চ' বাঁদিকে চ'।

যে নাথুলা রোড দিয়ে একেবারে বর্ডারে চলে যাওয়া যায়, সেটা দিয়ে আমি আর ফেলুদা এগিয়ে চললাম এক্সপেরিমেণ্টের উদ্দেশ্যে। রাস্তাটা ক্রমেই নির্জন হয়ে এসেছে। ফেলুদা বাঁদিকের খাড়াই পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছে। এদিকটা শহরের পুব দিক। কাঞ্চনজঙ্ঘা হল পশ্চিম দিকে। এদিকে বরফ দেখা যায় না,

তবে নীচে বহু দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা নদী দেখা যায়। আরেকটা জিনিস যেটা দেখা যায় সেটা হল রোপওয়ে। শূন্যে টাঙানো তারের রাস্তা দিয়ে ঝুলন্ত গাড়ি চলেছে মাল নিয়ে পাহাড়ের এ-মাথার এক স্টেশন থেকে ও-মাথার আরেক স্টেশনে।

রোপ-ওয়ে দেখতে এত ভালো লাগছিল যে ফেলুদার প্রথম ডাকটা শুনতেই পাইনি। তারপর শুনলাম, 'অ্যাই তোপ্‌সে—এদিকে আয়!'

পাহাড়ের গা বেয়ে খানিক দূর উঠে গেছে ফেলুদা, আর সেখান থেকে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আমিও উঠে গেলাম। ফেলুদার পাশে একটা পাথর পড়ে আছে—সাইজে সেটা একটা পাঁচ নম্বরের ফুটবলের মত।

'এই পাথরের পাশে দাঁড়া।'

দাঁড়ালাম। এরকম বাধ্য অ্যাসিস্টান্ট কোনো গোয়েন্দা কখনো পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

'আমি যাচ্ছি নীচে। ওদিক থেকে এদিকে হেঁটে যাবো। আমি যখন বলব, তখন তুই পাথরটা ঠেলে নীচের দিকে গড়িয়ে দিবি। যেভাবে রয়েছে পাথরটা, বুঝতেই পারছিস একটা ঠেলা দিলেই ওটা নিচের দিকে গড়িয়ে যাবে। পারবি ত?'

'জলের মত সোজা।'

ফেলুদা নীচে নেমে যেদিক দিয়ে এসেছি সেদিকটায় চলে গেল। তারপর শুনতে পেলাম ওর হাঁক—'রেডি?'

আমি চেঁচিয়ে বললাম 'রেডি'—আর তার পরেই পেলাম ফেলুদার পায়ের আওয়াজ।

আমার লাইনে আসার আট-দশ পা আগেই ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল—'গো!' আমি পাথর ঠেলে দিলাম। ফেলুদা হাঁটা থামাল না। দেখলাম পাথর গড়িয়ে রাস্তায় পেঁছনর আগেই ফেলুদা তার অন্তত দশ পা সামনে এগিয়ে চলে গেছে।

'দাঁড়া!'

ফেলুদা ফিরে এলো, সঙ্গে পাথর।

'এবার তুই নীচে যা। তোকে হাঁটতে হবে। হাঁটা থামাবি না। আমি পাথর ফেলব। যদি দেখিস পাথর তোর দিকে তাগ করে আসছে—হয়ত তোর গায়ে এসে লাগবে—তুই লাফিয়ে পাশ কাটাতে পারবি ত?'

'জলের মত সহজ!'

এবার আমি হাঁটতে শুরু করলাম—আড়চোখ পাহাড়ের দিকে। ফেলুদা খুব হিসেব করে জিভটিব কামড়ে একটা বিশেষ টাইমে পাথরটাকে মারল ঠেলা। আমি থামলাম না। লাফিয়ে পাশ কাটানোরও

দরকার হল না। পাথর আমি পৌঁছনর আগেই রাস্তায় পড়ে দুটো পাক খেয়ে ডান দিকের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে চলে গেল।

ফেলুদা যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল। কী আর করি—আমিও তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

'কী মূর্খ আমি! কী মূর্খ! এই সহজ—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একটা শব্দ আমার কানে আসতেই এক ঝলক উপরে তাকিয়ে এক হ্যাঁচ্‌কা টানে আমি ফেলুদাকে তার জায়গা থেকে প্রায় তিন হাত পাশে সরিয়ে আনলাম, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিরাট পাথরের চাঁই এক সেকেণ্ড আগে যেখানে ফেলুদা ছিল সেখান দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে বুনো লাল ফুলের একটা প্রকাণ্ড ঝোপড়াকে তছনছ করে দিয়ে রাস্তায় একবার মাত্র ঠোক্কর দিয়ে পিছনের ঢাল দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেলুদা 'জায়গাটা সত্যিই নিরাপদ নয়' বলে আমার হাত ধরে টেনে একেবারে রাস্তায়। তারপর দুজনে আর টুঁ শব্দটি না করে পা চালিয়ে এক নিশ্বাসে একেবারে তেমাথায় পৌঁছে গেলাম। একটা মিলিটারি লরি আমাদের পাশ কাটিয়ে নাথুলার দিকে চলে গেল। ফেলুদা খালি একবার মৃদুস্বরে বলল, 'থ্যাঙ্কস, তোপ্‌সে।' তার দিকে চেয়ে দেখি সে গম্ভীর হয়ে গেছে। আমার মনের যে কী অবস্থা সে আর বলে কাজ নেই।

কাছেই একটা ছাউনি দেওয়া বসবার ঘর ছিল। অনেকটা ইডেন গার্ডেনের ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের মত দেখতে। আমরা তার ভিতরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে হাঁপ ছাড়লাম। ফেলুদা কপালের ঘাম মুছে বলল—

'কাউকে দেখতে পেয়েছিলি?'

বললাম, 'না। অনেক উঁচু থেকে পাথরটা এসেছিল। আমি যখন দেখেছি তখনই তার ভেলসিটি অনেক।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ভালো করে একটা টান দিয়ে বলল, 'আর ঢিলেঢালা চলবে না। একটা কুইক্ এসপার-ওস্‌পার হওয়া দরকার।'

আমি বললাম, 'কিন্তু অনেক প্রশ্নের ত উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না ফেলুদা।

'কে বললে তোকে?' ফেলুদা খেঁকিয়ে উঠল। কাল রাত্রে কখন ঘুমিয়েছি জানিস? আড়াইটে। ফেলু মিত্তির ঘোড়ার ঘাস কাটছে না। এক্সপেরিমেণ্ট সাক্সেসফুল। যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। পাথর এসে গাড়িতে পড়েনি। ওয়ান ইন এ মিলিয়ন চান্সের উপর নির্ভর করে কেউ খুন করে না। প্ল্যানটা ছিল অন্য, কিন্তু সেটাকে অ্যাক্সিডেণ্টের চেহারা দেবার জন্য পাথরটা ফেলা হয়েছিল। মিস্টার শেলভাঙ্কারকে

অজ্ঞান করা হয়েছিল আগেই। তারপর তাকে জীপ সমেত খাদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল, তারপর সব শেষে ফেলা হয়েছিল পাথর।'

'কিন্তু তাহলে...ড্রাইভারটা যে...'

'ড্রাইভারকে হাত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই, কারণ এ ছাড়া জিনিসটা সম্ভব নয়।'

'কিম্বা ড্রাইভার ত নিজেই খুন করে থাকতে পারে?'

'না। কারণ, মোটিভ কী? তার পক্ষে মূর্তিটার কথা জানার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'আমাদের টার্গেট হচ্ছে SKM 463।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় SKM 463-র খোঁজ করে তাকে পাওয়া গেল না। সে গাড়ি কাল রাত্রেই নাকি শিলিগুড়ি চলে গেছে।

'আসলে কী জানিস, জীপটা নতুন বলে সকলেরই ওটার উপর চোখ। ওটা তাই আর বসে থাকে না।'

'তাহলে আমরা কী করব?'

'দাঁড়া, একটু ভাবতে দে। সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।'

জীপ-স্ট্যান্ড থেকে হোটেলে ফিরে এলাম। ডাইনিং রুমে বসে বেয়ারাকে ডেকে কোল্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলাম। ফেলুদার চোখ লাল, চুল উসকো-খুসকো, মুঠো করা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের তেলোতে বার বার ব্যর্থ ঘুঁষি মারছে।

'কবে পৌঁছেছি আমরা এখানে?' সে হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'চোদ্দই এপ্রিল।'

চোদ্দই না পনরই?'

'চোদ্দই। তুমি ভুলে যাচ্ছ ফেলুদা—সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ—'

'ইয়েস ইয়েস। আর খুন হয়েছে কবে?'

'এগারোই।'

'সেদিন গ্যাংটকে ছিল শেলভাঙ্কার, নিশিকান্ত, হেলমুট আর ডক্টর বৈদ্য।'

'আর বীরেন্দ্র।'

'ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্রও ছিল। ধরে নিচ্ছি প্রাইটেক্স ভুল করেনি। আচ্ছা...নিশিকান্তবাবু জানালা দিয়ে কবে কাগজ ফেলল?'

'যেদিন আমরা এসেছি, সেদিনই রাত্রে।'

'চোদ্দই রাত্রে। গুড। সে সময় কে কে ছিল শহরে?'

'হেলমুট, শশধর, ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্র, আর...আর...'

'নিশিকান্ত।'

'নিশিকান্ত ত থাকবেই!'

শুধু থাকবেই না। ও যদি কোনো গোলমাল করে থাকে, তাহলে নিজের উপর থেকে সন্দেহ হটিয়ে দেবার জন্য নিজেই নিজের ঘরে কাগজ ফেলতে পারে, নিজেই খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে হেল্প বলে চীৎকার করতে পারে।'

'কী গোলমাল করতে পারেন নিশিকান্তবাবু?'

'সেটা এখনো জানি না। খুন করার সাহস ওর আছে বলে মনে হয় না। লোকটা নেহাৎই ভীতু, আর সেটা অভিনয় নয়।'

'তাহলে আর কেউ বাকি রইল কি?'

'ডক্টর বৈদ্য! ডক্টর বৈদ্যকে বাদ দিবি না! তিনি কবে কালিম্পঙ গেছেন, বা অ্যাট অল গেছেন কিনা—সেটা ত আমরা জানি না! ডাকবাংলো থেকে যে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকেননি তার গ্যারাণ্টি কী?'

ফেলুদা এক চুমুকে এক গেলাস সিকিম অরেঞ্জ শেষ করে বলল, 'একমাত্র শশধরবাবুর গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নেই—কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে একই প্লেনে একই জীপে গ্যাংটক এসেছেন, এবং পরদিন বম্বে ফিরে গেছেন। ফিরে যে গেছেন সেটা তাঁর বাড়ির লোকে টেলিফোনে কনফার্ম করেছে। অবিশ্যি এখন তিনি বম্বেতে নেই। একটা চান্স আছে, হি ইজ অন হিজ ওয়ে হিয়ার। মনে হচ্ছে পেমিয়াংচিটা—'

ফেলুদা কথা থামাল। বাইরে থেকে একজন লোক এসে হোটেলের ভিতর ঢুকে ম্যানেজারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা আমাদের জার্মান হিপি হেলমুট উঙ্গার। ম্যানেজারকে কী জিগ্যেস করাতে তিনি আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন।

'ওঃ—তোমরা এখানেই আছ? আমি দেখতেই পাইনি।'

আমরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হেলমুটের যেন একটু কিন্তু কিন্তু ভাব। বলল, 'একটা জরুরী আলোচনা ছিল। তোমাদের ঘরে যাওয়া যায় কী?'

১০

ঘরে এসে ঢোকার পর হেলমুট বলল, 'মে আই ক্লোজ দ্য ডোর?' তারপর নিজেই গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আমার বুকের ভিতরে ঢিপ ঢিপ। বিরাট লম্বা লোক—ফেলুদার চেয়েও এক ইঞ্চি বেশি। তার উপর জার্মান। তার উপরে শুনেছি হিপিরা নানারকম নেশা করে। আর বিদেশীদের সঙ্গে বন্দুক-পিস্তল গোছের জিনিস থাকাটা কিছুই আশ্চর্য নয়। যদি কোনো বদ মতলবে এসে থাকে লোকটা?

ফেলুদা হেলমুটের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

'কোল্ড ড্রিঙ্ক বা চা-কফি কিছু চলবে?'

'নো থ্যাংকস।'

হেলমুট কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে বিছানার উপর রেখে বগল-দাবা করা আগ্‌ফা কোম্পানীর একটা বড় লাল খামের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বলল, 'তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাতে এনেছি। এগুলো কালার নেগেটিভে তোলা। এখানে প্রিণ্ট হয় না, তাই দার্জিলিং-এ পাঠিয়েছিলাম। আজই সকালে এনলার্জমেণ্টগুলো হয়ে এসেছে।'

হেলমুট একটা ছবি বার করল।

'এটা নর্থ সিকিম হাইওয়েতে তোলা। অ্যাক্সিডেণ্টটা যেখানে হয়, সেখান থেকে রাস্তাটা পাহাড়ের গা দিয়ে গা দিয়ে একেবারে উল্টোদিকের পাহাড়ে চলে গেছে। সরু ফিতের মত রাস্তাটাকে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা থেকে দেখা যায়। আমি ছবিটা তুলেছি ওই উল্টোদিকের রাস্তা থেকেই। গ্রাম, নদী আর দশ কিলোমিটার দূরে সিকিমের খানিকটা অংশ মিলিয়ে একটা চমৎকার ভিউ পাওয়া যায় ওখান থেকে। কথা ছিল শেলভাঙ্কার গুম্‌ফা যাবার পথে আমাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার গাড়ি আমার কাছ অবধি পেঁছায়নি। ছবি তুলতে তুলতে একটা শব্দ পেয়ে সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে আমি এই দৃশ্যটা পাই, যেটা আমি আমার টেলিফটো লেন্‌স দিয়ে তুলে রাখি।'

আশ্চর্য ছবি। এত দূর থেকে তোলা সত্ত্বেও মোটামুটি সবই বেশ

বোঝা যাচ্ছে। একটা জীপ পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তার কিছু উপরে রাস্তায় একটা লোক দাঁড়িয়ে পড়ন্ত জীপটার দিকে দেখছে। এটা বোধহয় ড্রাইভারটা। মুখ চেনার উপায় নেই. কিন্তু যে নীল রঙের জামা পরা রয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কোনো লোক ছবিটাতে নেই।

এবার হেলমুট আরেকটা ছবি বার করল। এটা আগেরটার কয়েক সেকেন্ড পরে তোলা। এটা আরো অদ্ভুত ছবি। এটার তলার দিকে দেখা যাচ্ছে জীপটা পাহাড়ের গায়ে ভাঙা অবস্থায় কাত হয়ে পড়ে আছে। আর ডান পাশে কিছু উপরে একটা ঝোপের পিছনে একটা কালো সুটপরা লোকের খানিকটা অংশ মাটিতে শোয়া অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ছবির উপর দিকে রাস্তায় ড্রাইভারটা। এবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পিছন করে মাথা উঁচু করে উপর দিকে দেখছে। ছবির একেবারের উপরের অংশে পাহাড়ের গায়ে এবার আরেকজন নতুন লোককে দেখা যাচ্ছে; তারও মুখ চেনার কোনো উপায় নেই, কিন্তু গায়ের জামার রঙ লালচে। সে একটা বড় পাথরের পিছনে উপুড় হয়ে রয়েছে।

তৃতীয় ছবিতে লাল পোশাক পরা লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না; নীল জামা পরা লোকটা দৌড়নর ভংগীতে ছবি থেকে প্রায় বেরিয়ে চলে গেছে; গাড়ি আর কালো সুট পরা লোক যেমন ছিল তেমনি আছে। আর পাহাড়ের গায়ে যে পাথরটা ছিল, সেটা পড়ে আছে রাস্তার উপর, একটা গাছের পাশে।

'রিমার্কেবল,' ফেলুদা বলে উঠল, 'অদ্ভুত ছবি। এরকম ছবি আমি কমই দেখেছি।'

'এরকম সুযোগও কমই পাওয়া যায়', হেলমুট বলল।

'তুমি ছবিগুলো তোলার পর কী করলে?'

'গ্যাংটকে ফিরে এলাম। হেঁটেই গিয়েছিলাম—হেঁটেই ফিরলাম। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় পেঁছনোর আগেই শেলভাঙ্কারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি গিয়ে শুধু পাথর আর ভাঙ্গা জীপ দেখেছি। গ্যাংটকে ঢুকতেই অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়েছি, আর পেয়েই সোজা হাসপাতালে চলে গেছি। আমি যাবার পরেও শেলভাঙ্কার ঘণ্টা দু-এক বেঁচেছিলেন।'

'তোমার ছবি তোলার ব্যাপারটা তুমি কাউকে বলনি?'

'বলে কী লাভ? যতক্ষণ না সে-ছবি প্রিণ্ট হয়ে আসছে ততক্ষণ ত সেটাকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। মুখের কথা কে বিশ্বাস করবে! অথচ আমি সেই মুহূর্ত থেকেই জানি ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিল, জানি যে জিনিসটা অ্যাক্সিডেণ্ট নয়, খুন। আরো

কাছ থেকে তুললে আবাশ্য খুনীর চেহারাটাও বোঝা যেত। কিন্তু বুঝতেই পারছ সেটা সম্ভব ছিল না।'

ফেলুদা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলল, 'ওই লাল পোশাক পরা লোকটা কি তাহলে বীরেন্দ্র?'

'ইম্পসিব্ল।' দৃঢ় গলায় বলে উঠল হেলমুট।

আমরা দুজনেই রীতিমত অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম।

'মানে?' ফেলুদা বলল। 'তুমি অত শিওর হচ্ছ কী করে?'

'কারণ আমিই হচ্ছি বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার।'

ফেলুদার চোখ ছানাবড়া হতে এই প্রথম দেখলাম।

'তুমি বীরেন্দ্র মানে? তোমার চুল কটা, তোমার চোখ নীল, তোমার ইংরিজিতে জার্মান টান...'

'ভেরি সিম্পল।' হেলমুট চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। 'আমার বাবা দুবার বিয়ে করেন। আমি প্রথম স্ত্রীর সন্তান। আমার মা ছিলেন জার্মান। বাবা যখন হাইডেলবার্গে ছাত্র ছিলেন, তখনই আলাপ, আর বিদেশে থাকতেই বাবা বিয়ে করেন। মা-র নাম ছিল হেল্গা। বিয়ের আগের পদবী ছিল উঙ্গার। আমি যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে জার্মানী গিয়ে সেটল করি, তখন বীরেন্দ্র নামটা ছেড়ে হেলমুট নামটা নিই, আর মা-র পদবীটা নিই।'

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। সত্যিই ত—জার্মান স্ত্রী হলে ছেলের চেহারা সাহেবের মত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

'বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'মা মারা যাবার পাঁচ বছর পর বাবা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন, তখন মনটা ভেঙে গেল। মাকে আমি ভীষণ ভালবাসতাম। বাবার উপরেও টান ছিল, কিন্তু ঘটনাটার পর মনটা কেমন জানি বিগড়ে গেল। বাবার উপর একটা ঘৃণার ভাব এলো মনে। তাই সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলাম। বহু কষ্ট করে, বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করে অবশেষে আমি ইউরোপে পেঁছিই। গোড়ায় কয়েক বছর কুলিগিরি থেকে এমন কোনো কাজ নেই যা করিনি। প্রায় সাত-আট বছর এইভাবে কষ্টে কাটে। তারপর ছবি তুলতে শিখি। ভালো ফটোগ্রাফার হিসাবে নামও হয়। অনেক পত্রিকায় আমার তোলা ইউরোপের অনেক দেশের ছবি ছাপা হয়। বছর চারেক আগে ফ্লোরেন্সে ছবি তুলছিলাম, সেখানে হঠাৎ বাবার এক বন্ধুর সামনে পড়ে যাই। তিনি আমাকে চিনে ফেলেন, আর তিনিই বাবাকে আমার সম্বন্ধে লিখে জানান। তারপর বাবা ডিটেকটিভ লাগান আমাকে খুঁজে বার করার জন্য। সেই থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করি, আর আমার চোখের মণির রঙটাও বদলে ফেলি।'

'কনট্যাকট লেনস?' ফেলুদা বলে উঠল।

হেলমুট একটু হেসে তার দুই চোখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দুটো পাতলা লেনস খুলে বার করে আমাদের দিকে তাকাল। অবাক হয়ে দেখলাম যে তার চোখ আমাদেরই মত কালো হয়ে গেছে। পরমুহূর্তেই আবার লেনস দুটো পরে নিয়ে হেলমুট বলে চলল—

'বছর খানেক আগে এক হিপির দলের সঙ্গে ভিড়ে ভারতবর্ষে আসি। দেশের উপর থেকে টান আমার কোনদিনও যায়নি। আমার পিছনে তখনও লোক লেগে ছিল। বাবা অনেক পয়সা খরচ করেছেন এই খোঁজার ব্যাপারে। কাটমুণ্ডুতে গিয়ে একটা মনাস্টেরিতে ছিলাম। যখন দেখলাম সেখানেও পিছনে টিকটিকি ঘুরছে, তখন সিকিমে চলে এলাম।'

ফেলুদা বলল, 'তোমাকে ফিরে পেয়ে তোমার বাবা খুশি হয়নি?'

'আমাকে চিনতেই পারেননি! আমি আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছি অনেক। তার উপরে আমার লম্বা চুল, আমার গোঁফ-দাড়ি, আমার চোখের নীল রং—এইসব কারণেই বোধহয় তিনি নিজের ছেলেকে চিনতেই পারলেন না। আমার কাছে বসে তিনি বীরেন্দ্র সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষে ফিরে আসার আগেই বাবার উপর থেকে আমার বিরূপ ভাবটা অনেকটা চলে গিয়েছিল; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক জিনিস মেনে নিতে শেখে। কিন্তু যখন দেখলাম তিনি আমাকে চিনলেন না, তখন আর নিজের পরিচয়টা দিলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়ত দিতাম, কিন্তু তার আর সুযোগ হল কই?'

'খুনী কে, এসম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা আছে?'

'ফ্র্যাঙ্কলি বলব?'

'নিশ্চয়।'

'আমার মতে ডকটর বৈদ্যকে কোনোমতেই পালাতে দেওয়া উচিত নয়।'

ফেলুদা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমি এব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত।'

হেলমুট (নাকি বীরেন্দ্র বলা উচিত?) বলল, 'ও ত জানে না আমিই বীরেন্দ্র, তাই ফস করে আমার সামনেই কালকে ওই নামটাই করে দিল। আর যে মুহূর্তে নামটা করল, সেই মুহূর্তেই আমার লোকটা সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেল। আমার মতে লোকটা এক নম্বরের ভণ্ড শয়তান। ও-ই খুন করেছে। এবং ও-ই মূর্তিটা নিয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'সেদিন শেলভাংকার যখন গুম্‌ফাটা দেখতে যান, উনি কি একাই যান?'

'সেটা বলতে পারি না। আমি ত অনেক সকালে বেরিয়ে পড়েছিলাম। অবিশ্যি ডক্টর বৈদ্য তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে গাড়িতে উঠে থাকতে পারেন। সন্দেহ বাতিকটা বাবার একেবারেই ছিল না। এমনিতে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি।'

ফেলুদা বিছানা ছেড়ে উঠে গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বলল, 'আমাদের সঙ্গে পেমিয়াংচি যাবে?'

হেলমুট দৃঢ়স্বরে বলল, 'বাবাকে যে খুন করেছে, তার হাতে হাতকড়া পরানোর জন্য আমি যে-কোনো জায়গায় যেতে প্রস্তুত আছি।'

'এখান থেকে কতদূর জান জায়গাটা?'

'একশো মাইলের কাছাকাছি বলে শুনেছি। হয়ত সামান্য বেশিও হতে পারে।'

'তার মানে ছ'সাত ঘণ্টার ধাক্কা।'

'রাস্তা খারাপ না হলে আরো তাড়াতাড়ি পেঁছান যেতে পারে। আমার মতে আজই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া উচিত।'

ফেলুদা বলল, 'আমারও তাই মত। আমি একটা জীপের ব্যবস্থা দেখছি। জিনিসপত্র সঙ্গে বেশি না নেওয়াই ভাল।'

'তুমি জীপ দেখ, আমি ডাকবাংলোর বুকিংটা সেরে রাখছি। বাই দ্য ওয়ে—'

হেলমুট ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থেমে ফেলুদার দিকে ঘুরে বলল, 'লোকটা যে-পরিমাণে ডেঞ্জারাস বলে মনে হচ্ছে, ওর কাছে বন্দুক-টন্দুক থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। এদিকে আমার কাছে ত ফ্ল্যাশ-গান ছাড়া আর কিছুই নেই! তোমাদের কাছে—'

হেলমুটের কথা শেষ হবার আগেই ফেলুদা তার সুটকেসের ভিতর হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বার করে হেলমুটকে দেখিয়ে দিল।

'আর এই যে আমার কার্ড।'

ফেলুদা তার 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর' লেখা ভিজিটিং কার্ডের একটা হেলমুটের দিকে এগিয়ে দিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেদিন আর কোনো জীপ ভাড়া পাওয়া গেল না। যে ক'টা ছিল সবগুলো আমেরিকান টুরিস্টরা নিয়ে সারাদিনের জন্য রুমটেক চলে গেছে। আগামীকাল সকালের জন্য জীপের ব্যবস্থা করে বেশির ভাগ দিনটাই হেঁটে গ্যাংটক শহর দেখে কাটিয়ে দিলাম।

দুপুরে বাজারের দিকটায় নিশিকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তাকে পেমিয়াংচির কথা বলতে তিনি অবিশ্যি লাফিয়ে উঠলেন।

সন্ধ্যের দিকে ভদ্রলোক একটা অদ্ভুত জিনিস এনে আমাদের দেখালেন। হাতখানেক লম্বা একটা কাঠি, তার ডগায় বাঁধা ছোট্ট একটা কাপড়ের থলি।

'কী জিনিস বলুন ত এটা', এক গাল হেসে জিগ্যেস করলেন নিশিকান্তবাবু। 'জানেন না ত? এই থলের ভিতর আছে নুন আর তামাকপাতা। পায়ে যদি জোঁক ধরে, এই থলির একটা ঘষাতেই বাবাজী খসে পড়বেন।'

ফেলুদা জিগ্যেস করল, 'নাইলনের মোজা ভেদ করেও জোঁক ঢোকে নাকি?'

'কিছুই বিশ্বাস নেই মশাই। গেঞ্জি, সার্ট আর ডবল পুলোভার ভেদ করেও বুকের রক্ত খেতে দেখেছি জোঁককে। আর মজা কী জানেন ত? ধরুন, লাইন করে একদল লোক চলেছে জোঁকের জায়গা দিয়ে। এখন, জোঁকের ত চোখ নেই—জোঁক দেখতে পায় না—মাটির ভাইব্রেশনে বুঝতে পারে কোনো প্রাণী আসছে। লাইনের মাথায় যে লোক থাকবে, তাকে জোঁক অ্যাটাক করবে না—কিন্তু তার ভাইব্রেশনে তারা সজাগ হবে। দ্বিতীয় লোকের বেলা তারা মাথা উঁচিয়ে উঠবে, আর থার্ড যিনি রয়েছেন, তাঁর আর নিস্তার নেই—তাঁকে ধরবেই।'

ঠিক হল আমরা প্রত্যেকেই একটা করে জোঁক ছাড়ানো লাঠি সঙ্গে নিয়ে নেবো।

শুতে যাবার আগে ফেলুদা বলল, 'দুদিন বাদেই বুদ্ধ পূর্ণিমা—এখানে উৎসব হবে।'

'সে উৎসব কি আমরা দেখতে পাব?' আমি ধরা গলায় জিগ্যেস করলাম।

'জানি না। তবে তার চেয়েও অনেক বড় পুণ্য কাজ হবে যদি আমরা শেলভাঙ্কারের হত্যাকারীকে কবজা করতে পারি।'

সারারাত আকাশ পরিষ্কার ছিল, আর আমাদের জানালা দিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল।

পরদিন ভোর পাঁচটায় আমি, ফেলুদা, হেলমুট আর নিশিকান্ত সরকার সামান্য জিনিসপত্র, চারটে কাগজের বাক্সে হোটেলের তৈরি দুপুরের লাঞ্চ আর চারখানা জোঁক ছাড়ানো লাঠি নিয়ে দুগ্‌গা বলে পেমিয়াংচির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

১১

গ্যাংটক থেকে পেমিয়াংচি যাবার দুটো রাস্তা আছে—একটা কিউশিং হয়ে, আরেকটা নামচি দিয়ে নয়াবাজার হয়ে। কিউশিং-এর রাস্তা দিয়ে গেলে দূরটা কম হয়, কিন্তু গত কদিনের বৃষ্টিতে সে রাস্তা নাকি খারাপ হয়ে গেছে, তাই আমাদের নয়াবাজার দিয়েই যেতে হবে। একশ সাতাশ মাইল পথ। এমনিতে হয়ত দুপুরের খাওয়াটা সারার জন্য নামচিতে থামতে হত, কিন্তু আমরা হোটেল থেকে লুচি আলুর তরকারি আর মাংসের কাটলেট নিয়ে নিয়েছি। তাছাড়া দুটো ফ্লাস্কে রয়েছে জল, আর দুটোতে গরম কফি; কাজেই পথে আর খাওয়ার জন্য থামতে হবে না। সাবধানে গেলেও ঘণ্টা আষ্টেকের বেশি সময় লাগা উচিত নয়। তাই মনে হয় বিকেলের আগেই আমরা পেমিয়াংচি পেঁছে যাব। হেলমুট দেখলাম একটার বেশি ক্যামেরা সঙ্গে নেয়নি, আর নিশিকান্তবাবু দেখি কোত্থেকে এক-জোড়া চামড়ার গোলোস জুতো সঙ্গে নিয়ে নিয়েছেন। বললেন, 'ভেবে দেখলাম, জোঁক যদি পায়ের পিছন দিকে ধরে, তাহলে ত আর দেখতে পাব না! নুনের থলি কোন্ কাজটা দেবে মশাই? তার চেয়ে এই গামবুটই ভাল—সেণ্ট পারসেন্ট সেফসাইড।'

'যদি গাছ থেকে মাথায় পড়ে জোঁক?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

নিশিকান্তবাবু মাথা নাড়লেন। 'ম্যাক্—মানে ম্যাক্সিমাম জোঁকের টাইম এটা নয়। সেটা আরো পরে—জুলাই অগাস্টে। এখন বাবাজীরা সব মাটিতেই থাকেন।'

নিশিকান্তবাবুকে বলা হয়নি যে আমরা খুনীর সন্ধানে চলেছি। উনি জানেন আমরা ফুর্তি করতে যাচ্ছি, তাই দিব্যি নিশ্চিন্তে আছেন। ওখানে গোলাগুলি চললে যে ওঁর কী দশা হবে তা জানি না।

সোয়া ছ'টার সময়ে আমরা সিংথাম পেঁছে গেলাম। এ জায়গাটা গ্যাংটক আসার সময়ও পড়েছিল। বাজারের মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে। বেশ গিজগিজে ছোট শহর, তিস্তার পাশেই। আমরা বাঁদিকে ঘুরে তিস্তার উপর দিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ে

উঠলাম। এখান থেকে শুরু করে বাকি রাস্তাটা হবে আমাদের কাছে নতুন।

আমাদের জীপটা নতুন না হলেও খুব বেশি পুরোন নয়। স্পীডোমিটার মাইলোমিটার, দুটোই এখনো কাজ করছে, সীটের চামড়াটামড়াও বিশেষ ছেড়েনি। ড্রাইভারের চেহারাটা দেখবার মতো। লোকটা বোধহয় নেপালী নয়, কারণ নেপালীরা সাধারণত বেঁটে হয়—এ রীতিমত লম্বা। কালো প্যাণ্ট, কালো চামড়ার জার্কিন, আর কালো সার্ট পরেছে। সার্টের বোতাম গলা অবধি লাগানো। মাথায় একটা ক্যাপ পরেছে যেটার রঙও প্রায় কালোই। আমেরিকান গ্যাংগস্টার ছবিতে মাঝে মাঝে এরকম চেহারার লোক দেখা যায়। ফেলুদা ওর নাম জিগ্যেস করতে বলল, 'থোণ্ডুপ'। নিশিকান্তবাবু বিজ্ঞের মতো বললেন, 'তিব্বতী নাম'।

ব্রিজ পেরিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে উঠতে উঠতে বুঝলাম এদিকের দৃশ্য একেবারে অন্যরকম। গাছপালা অনেক কম, আর মাটিটা লালচে আর শুকনো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বিহারের কোনো পাহাড়ে জায়গা দিয়ে চলেছি। এক এক জায়গায় রাস্তা খুবই খারাপ—আর তার মানেই সেখানে রাস্তা সারানোর কাজ হচ্ছে। নেপালী ছেলে-মেয়ের দল হয় পাথর সরাচ্ছে, না হয় পাথর ভাঙছে, না হয় মাটি ফেলছে। এই দু'দিনে নেপালী মেয়েদের দেখে কী করে চিনতে হয় সেটা ফেলুদার কাছে শিখে নিয়েছি। এদের কানে মাকড়ি, নাকে নথ আর গলায় মোটা হাঁসুলি। সিকিমের মেয়েরা প্রায় গয়না পরে না বললেই চলে। অবিশ্যি পোশাকেও তফাৎ আছে।

গ্যাংটক থেকে নামচি হল চৌষট্টি মাইল। আমি মাইল পোস্টের দিকে চোখ রাখছিলাম। বাইশ মাইল পেরোনর কিছু পরেই কানে একটা শব্দ এল। পিছন থেকে একটা জীপ বারবার হর্ন দিচ্ছে। থোণ্ডুপ কিন্তু পাশ দেবার কোনো আগ্রহ না দেখিয়ে কেবল আমাদের গাড়ির স্পীডটা একটু বাড়িয়ে দিল। ফেলুদা বলল, 'ও গাড়ির এত তাড়া কিসের?'

থোণ্ডুপ বলল, 'হর্ন দিক ও। ওকে এগোতে দিলে আপনাদের ধুলো খেতে হবে।'

সেদিনের মতোই ফেলুদা আর আমি সামনে বসেছিলাম, আর পিছনে হেলমুট আর নিশিকান্ত। আমরা স্পীড বাড়ানো সত্ত্বেও পিছনের জীপটা বার বার এগিয়ে আসছে আর হর্ন দিচ্ছে, এমন সময় নিশিকান্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন,—'আরে, এ যে সেই ভদ্রলোক!'

'কোন ভদ্রলোক?' বলে ফেলুদা পিছনে ফিরল, আর সেই সঙ্গে আমিও।

ওমা—এ যে শশধরবাবু! আমাদের পিছনে ফিরতে দেখে আবার গ্যাঁ গ্যাঁ করে হর্ন, আর শশধরবাবুর মরিয়া হয়ে হাত নাড়া।

ফেলুদা বলল, 'জারা রোক দিজিয়ে থোণ্ডুপজী—পিছনে চেনা লোক।'

আমাদের গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনেরটাও থামল, আর শশধরবাবু নেমে আমাদের দিকে দৌড়ে এলেন।

'আপনারা ত আচ্ছা লোক মশাই—সিংথামে এত চেঁচালুম আর শুনতেই পেলেন না!'

ফেলুদা অপ্রস্তুত। বলল, 'আরে আপনি আসছেন জানলে কি আর আপনাকে ছেড়ে আসি?'

'তা আপনি যেরকম টেলিগ্রাম করলেন তাতে কি আর ওখানে বসে থাকা যায়? আমি সেই তখন থেকে ফলো করছি আপনাদের।'

পিছনে থাকলে যে কিরকম ধুলো খেতে হয় সেটা শশধরবাবুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারছিলাম। আর কিছুক্ষণ এইভাবে চললে ভদ্রলোক একেবারে ভস্মমাখা সাধুবাবা হয়ে যেতেন।

'কিন্তু ব্যাপার কী? এই বললেন সন্দেহজনক ব্যাপার, আর সেসব ছেড়েছুড়ে এখন এদিকে কোথায় চলেছেন?'

ফেলুদা এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে মালপত্তর কি অনেক?'

'মোটেই না। কেবল একটা সুটকেস।'

'তাহলে এক কাজ করা যাক্। আপনার গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে চলুক; ওতে বরং আমাদের মালগুলো চাপিয়ে দিই। আপনি আমাদের এটার পেছনে বসে আসতে পারবেন ত?'

'নিশ্চয়ই!'

জীপ চলতে চলতে ফেলুদা গত দুদিনের ঘটনাগুলো শশধর-বাবুকে বলল। এমনকি হেলমুটের আসল পরিচয়টাও দিয়ে দিল। সব শুনেটুনে শশধরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'বাট হু ইজ দিস ডক্টর বৈদ্য? শুনেই ত ভণ্ড বলে মনে হচ্ছে। আজকের দিনে এসব বুজরুকির প্রশ্রয় দেওয়ার কোনো মানে হয় না। আপনাদের ওর হাবভাব দেখেই ওকে সোজাসুজি হুমকি দেওয়া উচিত ছিল। সেটা না করে আপনারা ওকে পেমিয়াংচি পালাতে দিলেন? সত্যি, আপনা-দের কাছ থেকে—'

ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, 'হেলমুটের আসল পরিচয়টা পাওয়া-তেই ত ওর উপর সন্দেহটা গেল। আর আপনার দিক থেকেও খানিকটা গলতি হয়েছে শশধরবাবু। আপনি ত একবারও বলেননি শেলভাঙ্কারের প্রথম স্ত্রী জার্মান ছিলেন।'

শশধরবাবু বললেন, 'আরে সে কি আজকের কথা মশাই? তাও জার্মান বলে জানতুমই না। বিদেশী, এইটুকুই শুনেছি। শেলভাঙ্কার প্রথম বিয়ে করে আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে।...আই হোপ বৈদ্য ব্যাটা সেখান থেকে সটকে পড়েনি। নাহলে এই এতখানি পথ যাওয়াটাই বৃথা হবে।'

নামচি পেঁছালাম ন'টার কিছু পরে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে; তবে নামচিতে নাকি বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। এটা নাকি সিকিমের সবচেয়ে শুকনো আর সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা। তাছাড়া সুন্দরও বটে, আর আশ্চর্যরকম পরিচ্ছন্ন। তা সত্ত্বেও আমরা মিনিট দশেকের বেশি থামলাম না। যেটুকু থামা, সেটুকু শুধু গাড়ির পেটে একটু ঠান্ডা জল, আর আমাদের পেটে একটু গরম কফি ঢালার জন্য। হেলমুট এর ফাঁকেই কয়েকটা ছবি তুলে নিল। লক্ষ্য করলাম সে কথা-টথা বিশেষ বলছে না। ছবিটা তোলা যেন অভ্যাসের বশে। শশধরবাবুরও চিন্তিত ও গম্ভীর। নিশিকান্তবাবু ফেলুদার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে একটু ঘাবড়েছেন বটেই, তবে ভিতরে ভিতরে মনে হল অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধটা পেয়ে তিনি বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ করছেন। নামচির বাজার থেকে একটা কমলালেবু কিনে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, 'বিপদ যাই আসুক না কেন মশাই, একদিকে প্রদোষ-বাবু আর একদিকে জার্মান বীরেনবাবুকে নিয়ে ডরাবার কোনো কারণ দেখছি না।'

নামচি থেকে রাস্তা নামতে নামতে একেবারে নদীর লেভেলে পেঁছে যায়। এই নদীর ধারেই নয়াবাজার। সেখান থেকে আবার একটা ব্রিজ পেরিয়ে অনেকখানি পথ এই নদীর ধার দিয়ে উঠে ন' হাজার ফুটের উপর পেমিয়াংচি। এ নদী তিস্তা নয়। এর জল তিস্তার মতো ঘোলা নয়। এর জল স্বচ্ছ সবুজ। মাঝে মাঝে জলের স্রোত পাথরে বাধা পেয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। এ নদীর নাম রঙ্গিত। এত সুন্দর পাহাড়ে নদী এর আগে আমি কখনো দেখিনি।

রঙ্গিতের পাশ দিয়ে পাক খেয়ে পাক খেয়ে আমরা যে পাহাড়ের উপর উঠছি, তাতে গাছপালা অনেক বেশি। এখানে মাটি লাল নয়, আর শুকনো নয়। এ যে বিহারের কোনো পাহাড় নয়, এ যে হিমালয়, তাতে কোনো ভুল নেই। শশধরবাবু বলেছিলেন ইয়াং মাউনটেনস—তাই ধস নামে। সেই ধসের যে কত চিহ্ন আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। সবুজ পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে ছাই-রঙের সব ক্ষতচিহ্ন—ঠিক মনে হয় পাহাড়ের পায়ে

বুঝি শেষাত হয়েছে। অজস্র গাছপালা বনবাদাড় সমেত পাহাড়ের এক একটা অংশ ধসে পড়েছে একেবারে নদীর কিনারে। এইসব ন্যাড়া অংশ নতুন করে গাছপালা হয়ে আবার কবে পাশের সবুজের সঙ্গে মিশে যাবে তা কে জানে।

একটা গুম্ফার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি সেই ভূত-তাড়ানো নিশানের ঝাড়। সবগুলো নিশানই তকতকে নতুন বলে মনে হচ্ছে। শশধরবাবু বললেন, 'সামনে বুদ্ধ পূর্ণিমা—তারই তোড়জোড় চলছে।'

ফেলুদা প্রথমে বোধহয় কথাটা শোনেনি। প্রায় মিনিট খানেক পরে বলল, 'কত তারিখে পড়ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা?'

শশধরবাবু বললেন, 'কালই বোধহয় পূর্ণিমা। কাল হল ১৭ই এপ্রিল।'

'সতরই এপ্রিল...তার মানে হল চৌঠা বৈশাখ...চৌঠা বৈশাখ...'

ফেলুদার বিড়বিড়ানি জীপের শব্দে আর কেউ বোধহয় শোনেনি। তারিখ নিয়ে এত কী চিন্তা করছে ফেলুদা? আর ও এত গম্ভীর কেন? আর হাতের আঙুল মটকাচ্ছে কেন?

পেমিয়াংচির আগের শহরের নাম গেজিং। এখানেও দেখি নিশানের ছড়াছড়ি। এখান থেকে পেমিয়াংচি তিন মাইল। জীপ ক্রমশ উপরে উঠছে। রাস্তা রীতিমত খাড়াই। এখানে গাছ কম, তবে উপরের দিকে চাইলেই দেখতে পাচ্ছি কালচে সবুজ রঙের ঘন বন। খানিকটা রাস্তা রীতিমত খারাপ। জীপকে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। মনে হল এদিকে বৃষ্টিটা গ্যাংটকের চেয়ে বেশি হয়েছে। জীপ ফোরহুইলে অতি সন্তর্পণে একটা গোলমেলে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা পেরোল। ঝাঁকুনির চোটে নিশিকান্তবাবুর মাথাটা জীপের উপরের লোহার রডের সঙ্গে ঠকাং করে লাগায় ভদ্রলোক 'উরেশ্শা' বলে উঠলেন।

একটু পরেই ক্রমে আলো কমে এল। এটা শুধু মেঘের জন্যে নয়। আমাদের জীপের এক পাশে এখন একটা গাঢ় সবুজ পাতা আর সাদা ডালপালাওয়ালা গাছের বন। হেলমুট বলল, 'ওগুলো বার্চ গাছ-- বিলেতে খুব দেখা যায়।'

এখন আমাদের জীপ এই বনের মধ্যেই রাস্তা দিয়ে চলেছে। আমাদের দুপাশে বন। তার মধ্যে দিয়ে আমরা চড়াই উঠছি সাপের মতো প্যাঁচালো রাস্তা দিয়ে।

এবার আরো গভীর বন, আরো বড় বড় গাছ। ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে হাওয়া। জীপের আওয়াজ ছাপিয়ে বনের ভিতর থেকে অচেনা পাখির তীক্ষ্ণ শিস। নিশিকান্তবাবু বললেন, 'বেশ থ্রি—মানে থ্রিলিং

লাগছে।'

রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল।

সামনে একটা সবুজ ঢিপি। উপরে খোলা মেঘলা আকাশ।

ক্রমে একটা বাংলোর টালিওয়ালা ছাদ দেখা গেল। তারপর পুরো বাংলোটা। এই সেই বৃটিশ আমলের বিখ্যাত বাংলো। পিছন দিকে আকাশের নীচে সবুজ থেকে আবছা নীল হয়ে যাওয়া থরে থরে সাজানো পাহাড়।

জীপ থামল। আমরা নামলাম। চৌকিদার বেরিয়ে এলো। আমাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে।

'আউর কোই হ্যায় ইঁহা?' শশধরবাবু জিগ্যেস করলেন।

'নেহি সাব—বাঙলা খালি হ্যায়।'

'আর কেউ নেই?' এবার ফেলুদা জিগ্যেস করল। 'আর কেউ আসেনি?'

এসেছিল। তিনি কাল রাত্রেই চলে গেছেন। দাড়িওয়ালা চশমাপরা বাবু।

১২

চৌকিদারের কথা শুনে হেলমুটই সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছে বলে মনে হল। সে কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ল।

শশধরবাবু বললেন, 'যা বুঝছি—ইমিডিয়েটলি কিছু করার নেই। একটা বাজে। অন্তত ডান হাতের ব্যাপারটা সেরে নেওয়া যাক।'

আমরা মালপত্র সমেত বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখেই বোঝা যায় আদ্যিকালের বাংলো। কাঠের ছাত, কাঠের মেঝে, সামনের দিকে কাঠের রেলিংওয়ালা বারান্দা, তাতে পুরনো ধরনের বেতের টেবিল চেয়ার পাতা। বারান্দা থেকে সামনের দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর। এখন মেঘ করে আছে, তা না হলে নাকি বাইশ মাইলের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। এক পাখির ডাক ছাড়া চারিদিকে কোনো আওয়াজ নেই। সব নিঝুম নিস্তব্ধ।

বারান্দা দিয়ে ঢুকে সামনের ঘরটা হল ডাইনিং রুম। টেবিলের চারিদিকে চেয়ার পাতা রয়েছে। এক পাশে আবার দুটো আরাম কেদারা। শশধরবাবু তার একটায় বসে পড়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনি ডিটেকটিভ হলেও আপনার অনুমান ঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু বৈদ্য লোকটা এভাবে পালানোতে এখন আমি কন্‌ভিন্‌স্‌ড। এস. এস. তার এমন একটা দামী জিনিস যাকে-তাকে দেখিয়ে খুব ভুল করেছে।'

হেলমুট বারান্দাতেই রয়ে গেল। নিশিকান্তবাবু বোধহয় বাথ-রুমের খোঁজে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন। ফেলুদা বাংলোর অন্য ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আমি আর কী করি—খাবার টেবিলের পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। এতদূর আসা বৃথা হবে, শেলভাঙ্কারের আততায়ী অল্পের জন্য হাত থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে যাবে, আমরা বোকার মত দৃশ্য দেখে গ্যাংটকে ফিরে যাবো—এসব কথা ভাবতেও খারাপ লাগছিল।

ডাইনিং রুমের পিছন দিকের দুটো দরজা দিয়ে দুটো বেডরুমে যাওয়া যায়। ডান দিকের দরজাটা দিয়ে ফেলুদা বেরিয়ে এলো, হাতে

একটা লাঠি।

এই লাঠিটাই ডক্টর বৈদ্যর হাতে দেখেছিলাম না?

'ভদ্রলোক এসেছিলেন ঠিকই,' ফেলুদার গলার স্বর শুক্‌নো আর ভারী, 'কারণ তিনি চিহ্নস্বরূপ তাঁর লাঠিটা ফেলে গেছেন। ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

নিশিকান্তবাবু রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন। তারপর 'অদ্ভুত জায়গা' বলে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে বিশ্রী শব্দ করে হাই তুললেন।

ফেলুদা বসল না। ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ডক্টর বৈদ্যর লাঠিটা ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় ঠক্ ঠক্ করে অন্যমনস্ক-ভাবে ঠুকতে লাগল।

শশধরবাবু বললেন, 'কই, মিস্টার সরকার—আপনাদের ওই খাবারের বাক্সগুলো খুলুন! মিথ্যে খিদে বাড়িয়ে লাভটা কী?'

'খাওয়া পরে হবে।'

কথাটা বলল ফেলুদা। আর যেভাবে বলল তাতে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। নিশিকান্তবাবু উঠতে গিয়ে থতমত খেয়ে থপ্ করে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। শশধরবাবুও অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন। কিন্তু ফেলুদা আবার যেই কে সেই।

সে চেয়ারে বসল। লাঠিটা টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে পকেট থেকে একটা চারমিনার বার করে ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে বলল, 'ঘাটশিলায় আমার এক পুরোন বন্ধু রয়েছে। আপনি এখানে আসার আগে ত ঘাটশিলায় গিয়েছিলেন—তাই না, শশধরবাবু?'

শশধরবাবুর জবাব দিতে দেরি হল না।

'হ্যাঁ—এক ভাগনের বিয়ে ছিল।'

'আপনি ত হিন্দু?'

হঠাৎ এ-প্রশ্ন করল কেন ফেলুদা?

'তার মানে?' শশধরবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন ফেলুদার দিকে।

'নাকি বৌদ্ধ—না খৃষ্টান—না ব্রাহ্ম—না মুসলমান?'

'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

'বলুন না।'

'হিন্দু—ন্যাচারেলি।'

'হুঁ!' ফেলুদা গম্ভীরভাবে সিগারেটে টান দিয়ে দুটো রিং ছাড়ল। তার একটা বড় হতে হতে শশধরবাবুর মুখের কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

'কিন্তু—' ফেলুদার চোখে ভ্রূকুটি, দৃষ্টি সোজা শশধরবাবুর দিকে, '—আপনি আর আমরা ত একদিন একসঙ্গে প্লেনে এলাম।

আপনি তখন সবে ঘাটশিলা থেকে বিয়ে সেরে ফিরছেন, তাই না?'

'এতে আপনি গোলমালটা কোথায় দেখছেন মিস্টার মিত্তির? আপনার কথার কোনো মাথামুণ্ডু আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ঘাটশিলার বিয়ের সঙ্গে আজকের ঘটনার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক এই যে, চৈত্র মাসে ত হিন্দুদের বিয়ে হয় না শশধরবাবু! ওটা যে নিষিদ্ধ মাস! ও মাসে কোনো লগ্ন নেই—শাস্ত্রের বারণ! আপনি সেই চৈত্র মাসেই আপনার ভাগ্নের বিয়ে দিলেন?'

শশধরবাবু সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিম্বা পারলেন না। তাঁর হাত দু'টো কাঁপছে।

'আপনি কী ইম্‌প্লাই করছেন? কী বলতে চাইছেন আপনি?'

ফেলুদা নিরুদ্বেগ। সে চেয়ে রয়েছে সোজা শশধরবাবুর দিকে, তার চোখের পাতা পড়ছে না।

প্রায় পুরো এক মিনিট এইভাবে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'ইম্‌-প্লাই করছি অনেক কিছু। এক নম্বর—আপনি মিথ্যেবাদী। আপনি ঘাটশিলায় যাননি। দু নম্বর—আপনি বিশ্বাসঘাতক—'

'মানে?' শশধরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমরা জানি শেলভাঙ্কার কোন একটা কারণে ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলেন। সেকথা তিনি বীরেন্দ্রকে বলেছিলেন—যদিও কারণ বলেননি। অনেক সময় খুব কাছের কোনো লোকের দ্বারা প্রতারিত হলে এ-জিনিসটা হয়। আমার বিশ্বাস সে-লোক হলেন আপনি। আপনি ছিলেন তাঁর পার্টনার। তিনি ছিলেন সরল, বিশ্বাসী মানুষ। তাঁর সন্দেহবাতিকটা ছিল না একেবারেই। সুতরাং তাঁকে ঠকাবার অনেক সুযোগ ছিল। আপনি সে-সুযোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিলেন—এবং জানতে পেরে তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর জানার ব্যাপারটা আপনি জানতে পারেন—আর জানার পর থেকেই তাঁকে সরাবার পথ খুঁজছিলেন। বম্বেতে সেটার সুবিধে হয়নি। তিনি সিকিমে এলেন। আপনার আসার কথা ছিল না। আপনিও এলেন। হয়ত তিনি আসার পরের দিনই। আপনি মানে নট শশধর বোস, বাট ডক্টর বৈদ্য—অর্থাৎ ছদ্মবেশী শশধর বোস। বৈদ্য শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ করল, গণৎকার সেজে তাঁর বিষয় জানা কথাগুলোই তাঁকে বলল, তাঁকে ইম্প্রেস্‌ করল। দুজনে একসঙ্গে গুম্‌ফায় গেলেন বীরেন্দ্রর খোঁজ করতে। আপনি নিশ্চয়ই গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। পথে পিছন দিক থেকে মাথায় লাঠির বাড়ি মেরে তাঁকে অজ্ঞান করলেন। ড্রাইভারকে আগেই হাত করেছিলেন —পয়সায় কী না হয়! তারপর গাড়ি ফেলা। তারপর পাথর ফেলা—আপনার ওই লাঠির সাহায্যে। তখনও শেলভাঙ্কার মরেননি। হয়ত

তিনি শেষ মুহূর্তে আপনাকে চিনে ফেলেছিলেন, এবং সেই কারণেই মরবার আগে আপনার নাম করেন।'

'ননসেন্স!' শশধরবাবু চীৎকার করে উঠলেন, 'কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি! কী প্রমাণ আছে যে আমি ডক্টর বৈদ্য?'

ফেলুদা এবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল।

'আপনার আংটিটি কোথায় গেল শশধরবাবু?'

শশধরবাবু কিরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

'আমার...'

'হ্যাঁ, আপনার। আপনার "মা" লেখা সোনার আংটি। আঙুলে দাগ রয়েছে, অথচ আংটি নেই কেন?'

'ও—ওটা..' শশধরবাবু ঢোক গিললেন, '—ওটা আঙুলে টাইট হচ্ছিল, তাই—' ভদ্রলোক কোটের পকেট থেকে আংটি বার করে দেখালেন।

'মেক-আপ চেঞ্জ করে পরতে ভুলে গেছিলেন—তাই না? ওই একই আঙুলের দাগ সেদিন মোমবাতির আলোয় দেখেছিলাম শশধর-বাবু। তখনই একটা খট্‌কা লেগেছিল, কিন্তু কেন তা বুঝতে পারিনি।'

শশধরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন—ফেলুদা গর্জন করে উঠল—'বসুন! আরো আছে!'

শশধরবাবু বসলেন, ঘাম মুছলেন। ফেলুদা বলে চলল—

'শেলভাঙ্কার খুন হল। ডক্টর বৈদ্য তার পরের দিন বললেন কালিমপঙ যাচ্ছেন লামার সঙ্গে দেখা করতে। আসলে কিন্তু তা নয়! আসলে ডক্টর বৈদ্য ওরফে শশধর বোস চলে এলেন কলকাতা। এদিকে শশধর বোস আগেই টেলিগ্রাম করেছিলেন 'অ্যারাইভিং ফোর্টিন্থ'। সেটা পেয়ে শেলভাঙ্কার বিস্মিত ও বিচলিত হন—কারণ আপনার সিকিমে আসার কোনো কথা ছিল না—এবং শেলভাঙ্কার আপনাকে অ্যাভয়েড করতেই চাইছিলেন। যাই হোক—আপনি ফোর্টিনথ এলেন—কারণ এই আসাটাই হবে আপনার অ্যালিবাই। চোদ্দই এসে শেলভাঙ্কারের মৃত্যুতে আক্ষেপের ভাণ করে আপনি পনরই বললেন বম্বে ফিরছেন। আসলে আপনি বম্বে যাননি, গ্যাংটকের আশে পাশেই কোথাও রয়ে গেছিলেন গা-ঢাকা দিয়ে। সেদিনই সন্ধ্যায় ডক্টর বৈদ্যর বেশে আপনিই আমাদের ভেলকি দেখালেন। আপনি জেনেছিলেন আমি ডিটেকটিভ—তাই আপনিই পেমিয়াংচি রওনা হবার আগে পাথর গড়িয়ে আমাকে সাবাড় করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং আপনিই রুমটেকে আমাদের ফলো করে গিয়ে—'

ঘরের মধ্যে একজন একটা বিকট হু হু হু শব্দ করে উঠল—

কান্না আর ভয়ের মাঝামাঝি। ইনি নিশিকান্ত সরকার।

'বসুন নিশিকান্তবাবু।' ফেলুদা বলল, 'আর লুকিয়ে লাভ নেই। আপনি খুনের জায়গায় গিয়েছিলেন কেন? আর কাকে দেখেছিলেন সেখানে?'

নিশিকান্তবাবু হাত দুটোকে হ্যাণ্ডস্ আপের মত করে মাথার উপর তুলে আবার সেই কোঁকানির সুরে বললেন, 'মশাই, জানতুম না ওই মূর্তিটা এত ভ্যা—মানে ভ্যালুয়েবল্। তারপর যখন জানলুম—'

'টিবেটান ইনস্টিটিউটে আপনিই গেস্লেন?'

'হ্যাঁ স্যার—আমিই। চাইতেই অন দি স্পট হাজার টাকা দিয়ে দিলে। তাই সন্দেহ হল। তাই গেলাম—তা বলে কিনা ইউ—মানে ইউনিক জিনিস। তাই মানে—'

'ভাবলেন মরা লোকের পকেট মারতে ক্ষতি কী? বিশেষ করে এককালে সে জিনিসটা যখন আপনারই ছিল!'

'সেই—মানে, সেই আর কি!'

'কিন্তু আপনি সেদিন খুনের জায়গায় কাউকে দেখেননি?'

'না স্যার!'

'আপনি না দেখলেও, সে আপনাকে নিশ্চয়ই দেখেছিল—এবং ভেবেছিল আপনি তাকে দেখে ফেলেছেন। নইলে আর আপনাকে শাসাবে কেন?'

'তা হবে!'

'মূর্তিটা কোথায়?'

'মূর্তি?' নিশিকান্তবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ফেলুদাও অবাক।

'সে কি!...আপনি তাহলে—'

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ আর তার সঙ্গে একটা কেলেঙ্কারি। শশধরবাবু তার চেয়ার ছেড়ে উঠে একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে দরজার মুখে দাঁড়ানো হেলমুটকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে বাংলো থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজা একটাই, আর তার সামনে হেলমুটের গড়িয়ে পড়া শরীর--তাই ফেলুদার বেরোতে দশ সেকেণ্ডের মত দেরী হয়ে গেল।

সবাই যখন বাইরে পেঁৗছেছি তখন জীপের এঞ্জিন গর্জন করে উঠেছে। এই ড্রাইভারটাকেও নিশ্চয় হাত করা ছিল, আর সে এই ধরনের বিপদের জন্য তৈরিই ছিল। শশধরবাবুকে নিয়ে জীপ প্রচণ্ড বেগে ঢাল নেমে বনের দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে আমাদের জীপটাও গর্জিয়ে উঠেছে, কারণ থোণ্ডুপ

বুঝেছে যে আমরা নিশ্চয়ই ফলো করব। কিন্তু তার আর দরকার হল না। গাড়ি অদৃশ্য হবার আগেই ফেলুদার রিভলভারের দুটো অব্যর্থ গুলি তার পিছনের দুটো টায়ারকে ফাঁসিয়ে দিল।

জীপটা রাস্তার একদিকে কেদ্রে গিয়ে একটা গাছের গায়ে ধাক্কা লেগে থেমে গেল। দেখলাম শশধরবাবু লাফিয়ে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের দিকে ছুটলেন। ড্রাইভারটা উল্টোদিক দিয়ে বেরিয়ে জীপের স্টার্টিং হ্যান্ডেলটা উঁচিয়ে এগিয়ে এলো। ফেলুদা তাকে অগ্রাহ্য করে ছুটল বনের দিকে—আমরা তিনজন তার পিছনে। ড্রাইভারকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের থোণ্ডুপও তার জীপের হ্যান্ডেলটা হাতে নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমরা চারজন অন্ধকার বনের ভিতর ঢুকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় দশ মিনিট খোঁজার পর হেলমুটের একটা হাঁক শুনে তার দিকে গিয়ে দেখি, শশধরবাবু একটা প্রকাণ্ড বুড়ো গাছের পাশে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত মুখ করে অদ্ভুত ভাবে লাফাচ্ছেন আর ছট্ফট্ করছেন।

আরো কাছে যেতে বুঝলাম যে তাঁকে জোঁকে ধরেছে—একটা নয়—অন্তত দুশো তিনশো লক্লকে জোঁক তাঁর দুই পায়ের হাঁটু অবধি, আর কাঁধে, ঘাড়ে আর কনুইয়ের কাছটায় কিলবিল করছে। হেলমুট বলল, 'ভদ্রলোক বোধহয় এই আল্গা শেকড়টায় হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়েছিলেন, তাতেই এই দশা।'

ফেলুদা শশধরবাবুর কোটের কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে তাকে বনের বার করল। তারপর আমাকে বলল, 'দৌড়ে গিয়ে জোঁকছাড়ানো কাঠিগুলো নিয়ে আয়।'

* * * *

আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে আছি। হেলমুট বাইরে দাঁড়িয়ে অর্কিডের ছবি তুলছে। থোণ্ডুপ গেজিং থেকে পুলিশ নিয়ে এসেছে। মূর্তিটা শশধরবাবুর কাছেই পাওয়া গেছে। খুনের সময় মূর্তিটা নেবার কথা তাঁর খেয়াল হয়নি। পরের দিন সেটার কথা মনে পড়ায় লোভ সামলাতে না পেরে খুনের জায়গায় ফিরে গিয়ে সেটা একটা ঝোপের পাশ থেকে খুঁজে বার করেন। উনি যখন মূর্তি নিয়ে উঠে আসছেন, তখন নিশিকান্তবাবু একই উদ্দেশ্যে নামছেন। নিশিকান্ত শশধরকে দেখেনি, কিন্তু শশধর নিশিকান্তকে দেখেছে, আর সেই থেকে তাকে শাসাতে শুরু করেছে।

আরো একটা ব্যাপার—বম্বেতে নাকি শশধরবাবুর একটি সাক্রেদ ছিল—তার সঙ্গে গ্যাংটক থেকে শশধরবাবুর টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল। সেই সাক্রেদই নাকি ফেলুদার টেলিফোন ধরে, এবং ফেলুদার

টেলিগ্রামের খবরটা সে-ই নাকি গ্যাংটকে শশধরবাবুকে জানায়।

ফেলুদা সঙ্গে পান এনেছিল; চিবোতে চিবোতে নিশিকান্ত-বাবুকে বলল, 'আপনিও যে একটি ছোটখাটো ক্রিমিন্যাল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নেহাৎ আপনার ভাগ্য ভালো তাই আপনি যমন্তকটা ফিরে পাননি। পেলে আপনার জন্যে একটা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হত।'

নিশিকান্তবাবু কাঁচুমাচু ভাব করে বললেন, 'পানিশমেণ্ট ত হয়েচেই স্যার! তিন তিনখানা জোঁক বেরিয়েছে আমার ডান পায়ের মোজার ভিতর থেকে। অনেক রক্ত খেয়েছে ব্যাটারা। ফলে বেশ উইক বোধ করছি।'

'যাই হোক—ঠাকুরদাদার সংগ্রহ করা কোনো তিব্বতী জিনিস আশা করি ভবিষ্যতে বিক্রী করবেন না। এই নিন আপনার বোতাম।'

এই প্রথম লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোকের সার্টের গলার সবচেয়ে নীচের বোতামটা নেই।

নিশিকান্তবাবু বোতামটা ফেরত নিয়ে তাঁর চারকোণা গোঁফের নীচে সেই পুরনো হাসিটা হেসে বললেন, 'থ্যা—থ্যাংকস।'